শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত
(কলিকাতা গেজেট, ১৮ই জুন, ১৯৪৫)

কাঞ্চনজঙ্ঘা-সিরিজের ষষ্ঠ গ্রন্থ

রাত্রির যাত্রী

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব-সাহিত্য-কুটীর
২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

পুনর্মুদ্রণ—১৩৫২
দাম বারো আনা

প্রিণ্টার—এস, সি, মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

শিক্ষাবিভাগ কর্ত্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

(কয়েকখানি ছেলেমেয়েদের ভাল গল্পের বই)

প্রতাপসিংহ (ছেলেদের নাটক)	‖০
প্রেমাবতার যীশুখৃষ্ট	১৲
ছোঃ শাহনামা	১৲
শিশুনাটিকা (ছেলে মেয়েদের নাটক)	‖০
জীবজগতের আজব কথা	১‖০
মেজিকের খেলা	১৲
রক্তমুখী ড্রাগণ	১৲
অদ্ভুত যত ভূতের গল্প	১।০
উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে	৸০
হারানো দিন	১৲
সমুদ্রজয়ী কলম্বস	১৲
ঋষি অরবিন্দ	১৲
বলদর্পি হিট্‌লার	১৲
রত্নদ্বীপের বিভীষিকা	১৲
নিশির ডাক	১৲
বিষের তীর	৸০
যাদুকর মার্কনী	১৲
রাক্ষুসে আফ্রিকা	১৲
দুই ভাই	১।০
বর্ষমঙ্গল	২‖০

কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ
ও
প্রহেলিকা সিরিজ

(ডিটেক্‌টিভ্‌ শিশু-উপন্যাস)

রাতের অতিথি	১৲
কবরের নীচে	১৲
সূর্য্যনগরীর গুপ্তধন	১।০
মিঃ গশ্‌ ডিটেক্‌টিভ	১৲
কাল বৈশাখী ঝড়	১৲
ব্লাড্‌ হাউণ্ড	১৲
তিব্বৎ ফেরত তান্ত্রিক	৸০
জীবনের মেয়াদ	১৲
অস্তাচলের পথে	১৲
কালের কবলে	১৲
দরদী বন্ধু	১৲
শেষ বলি	১৲
শেষ নিশ্বাস	১৲
নৈশ অভিযান	১৲
উদাসী বাবার আখড়া	৸০
কেউটের ছোবল	৸০
মুখোশের অন্তরালে	১৲
মৃত্যুদূত	১৲

দেব সাহিত্য-কুটীর—২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

…ফিরে দাঁড়িয়ে আমার পেটে মারলে এক লাথি।…

রাত্রির যাত্রী

এক

আমি খবরের কাগজের এই খবরটি প'ড়ে শোনালুম:

বিচিত্র হত্যাকাণ্ড!

"যুদ্ধ বাধিয়াছে য়ুরোপে, অন্ধকারে ভুগিতেছে কলিকাতা নগরী।

কালা আদমির দেশে আসিয়াছে কালো অন্ধকার, বলিবার কথা কিছুই নাই।

রাত্রে এখানে গ্যাসের আলোকস্তম্ভগুলো একেবারে না নিবিয়া রাজধানীর মুখরক্ষা ও নিজেদের নামরক্ষা করে বটে, কিন্তু প্রাণরক্ষা করিবার আপ্রাণ চেষ্টায় পথিকদের হইতেছে প্রায়-প্রাণান্ত।

নগর-পিতারা যেটুকু আলোর ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার সাহায্যে অন্ধকারকে আরো ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাওয়া যায়, কিন্তু সেই অন্ধকারের মধ্যে যে-সব মারাত্মক রহস্য আত্মগোপন করিয়া থাকে, চর্ম্মচক্ষু তাহাদের আবিষ্কার করিতে পারে না।

অলিগলিগুলো হইয়া উঠিয়াছে অধিকতর ভয়াবহ। কলিকাতায় বড় বড় রাজপথ আছে গুটি-কয়েক; কিন্তু অলি-

আলোর সংখ্যা হয় না। এখানকার গ্যাসপোস্টগুলোর প্রধান কর্তব্য যেন, আলোককে ব্যঙ্গ করা। একটা দেশলাইয়ের কাঠির মুখে যতটুকু আলো ধরে, তাদের সম্বল তার বেশী নয়। গলির গ্যাসপোস্টগুলো যেন পূর্ণগ্রহণের চাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করিতে চায়।

এই বিভীষিকাময় ছায়া-মায়ার মধ্যে কলিকাতা সহরে বেড়াইতে আসিয়াছে এক বিভীষণ রাত্রির-যাত্রী! তার নাম-ধাম কেহ জানে না, ঘটনাস্থলে সে রাখিয়া যায় কেবল এক-একটা রক্তাক্ত মৃতদেহ এবং একখানা করিয়া অত্যাশ্চর্য্য visiting card!

গত ২১শে জুলাই তারিখে প্রথম ঘটনাটি ঘটে।

ডাক্তার মোহিনীমোহন দত্ত রাত্রি প্রায় বারোটার সময়ে রোগী দেখিবার জন্য 'ফোনে' বিশেষভাবে আহূত হন। রোগীর ঠিকানা ছিল ২৫ নং বিশু বসুর লেনে। অত রাত্রে মোহিনীবাবু প্রথমে বাহিরে যাইতে স্বীকৃত হন নাই। তখন তাঁহাকে ডবল ভিজিটের লোভ দেখানো হয়।

বিশু বসুর লেনের মুখে গিয়া মোহিনীবাবু নিজের মোটর হইতে নামিয়া পড়েন, কারণ গলির ভিতরে গাড়ী ঢুকে না। "ব্ল্যাক-আউটে"র মহিমায় কলিকাতার বড় রাস্তাতেই আজকাল পথিক দুর্লভ, সুতরাং বিশু বসুর লেনের মত ছোট গলি যে অত রাত্রে জনশূন্য ছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য।

তাহার পর কি ঘটে, স্বচক্ষে কেহ তাহা দেখে নাই।

ঘণ্টাদুয়েক অপেক্ষা করিবার পর মোহিনীবাবুর ড্রাইভার তাহার মনিবের খোঁজে গলির ভিতরে প্রবেশ করে। এবং

খানিক দূর অগ্রসর হইবার পর দেখিতে পায় মোহিনীবাবুর মৃতদেহ।

তাঁহার মৃতদেহ পড়িয়া ছিল পথের উপরেই। তাঁহার বক্ষের উপরে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাত।

এবং সব-চাইতে বিস্ময়কর ব্যাপার হইতেছে, লাসের পাশেই পাওয়া গিয়াছে একখানা তাসের পাঞ্জা! তাহার পাঁচটা ফোঁটার মধ্যে একটা ফোঁটা ছুরি দিয়া কাটিয়া লওয়া হইয়াছে!

পুলিস খোঁজ লইয়া জানিয়াছে যে, বিশু বসুর লেনের মধ্যে কুড়ির বেশী বাড়ীর নম্বর নাই।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটিয়াছে ২৮শে জুলাই তারিখে।

এই রাত্রেও ১টার সময়ে ডাক্তার এন. বসু 'ফোনে' এক জরুরি ডাক পান। ডাক আসে ৩০ নং মণিলাল মিত্রের লেন হইতে। এই গলিটিও অত্যন্ত সংকীর্ণ—দুইজন মানুষ পাশাপাশি চলিতে পারে না।

এখানেও হইয়াছে একই-রকম সাংঘাতিক দৃশ্যের অভিনয়! ডাক্তার বসুর ফিরিতে অসম্ভব বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া তাঁহার মোটরচালক গলির ভিতরে প্রবেশ করে এবং পথের উপরে আবিষ্কার করে প্রভুর মৃতদেহ! তাঁহারও বক্ষের উপরে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাত এবং দেহের নিকটে পাওয়া গিয়াছে একখানা তাসের পাঞ্জা!

নূতনত্বের মধ্যে কেবল এই যে, এবারে তাসের পাঁচ ফোঁটার মধ্যে দুইটি ফোঁটা ছুরি দিয়া কাটিয়া লওয়া হইয়াছে!

এবারেও পুলিসের খোঁজে প্রকাশ পাইয়াছে যে, মণি মিত্রের লেনে ৩০ নম্বরের বাড়ী নাই।

এইদুইটি অদ্ভুত হত্যার মধ্যে যে-সকল সাদৃশ্য আছে,

তাহা কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না। দুইজন হত ব্যক্তিই চিকিৎসক, দুইজনেই আহূত হইয়াছেন 'ফোনে', মধ্য রাত্রে এবং এমন এক নম্বরের বাড়ীতে যাহার অস্তিত্ব নাই! দুই বারেই হত ব্যক্তির দেহের পাশে বা কাছে পাওয়া গিয়াছে তাসের পাঞ্জা!

ইহা যে একই হত্যাকারীর কীর্ত্তি, সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, উপরি-উপরি দুই চিকিৎসককে হত্যা করা হইল কেন? পুলিসের তদন্তে জানা গিয়াছে যে, হত ব্যক্তিদের কোন শত্রু নাই এবং তাঁহাদের মৃত্যুতে কাহারও লাভবান হইবারও সম্ভাবনা নাই। মৃত ব্যক্তিদের কাছ হইতে কোন মূল্যবান দ্রব্য বা টাকার ব্যাগও চুরি যায় নাই—সুতরাং চুরি বা রাহাজানিও হত্যার উদ্দেশ্য নহে।

আর এক প্রশ্ন: দুইবারের ঘটনাস্থলে তাসের পাঞ্জা পাওয়া গিয়াছে কেন? এবং প্রথম বারে একটা ফোঁটা ও দ্বিতীয় বারে দুইটা ফোঁটাই বা কাটিয়া লওয়া হইয়াছে কেন?

পুলিস এ-সব প্রশ্নের কোনই সদুত্তর খুঁজিয়া পাইতেছে না।"

ইজি-চেয়ারে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় শ্রবণ করছিল হেমন্ত।

সখের গোয়েন্দা হেমন্তের পরিচয় এখানে নূতন ক'রে দেবার দরকার নেই। যাঁরা এখনো তাকে চেনেন না, তাঁরা "অন্ধকারের বন্ধু" নামে উপন্যাস পাঠ করতে পারেন।

আমার পড়া শেষ হ'ল। কিন্তু হেমন্ত কোন কথা কইলে না, কেবল দুই চোখ মুদে ফেললে।

আমি বললুম, "কিহে, এই একটু আগেই তুমি অভিযোগ করছিলে যে, খবরের কাগজে কোন খবরের মতন খবর পাওয়া যায় না। এ ঘটনা দুটোও কি উল্লেখযোগ্য নয় ?"

হেমন্ত চোখ খুলে ধীরে ধীরে বললে, "হ্যাঁ, উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আলোচনাযোগ্য নয়।"

—"কেন ?"

—"খবরের কাগজের রিপোর্টের ভিতরে থাকে পাঠকদের সময় কাটাবার উপাদান। আর আসল সূত্র থাকে পুলিসের হাতে। মিথ্যে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি, তার চেয়ে এস বন্ধু, এক চাল দাবা খেলা যাক্!"

দুই

তাসের তৃতীয় পাঞ্জা

সেদিনও চলছে আমাদের চিরন্তন দাবা-খেলা।

আমি রোজ সকালেই হেমন্তের বাড়ীতে এসে চা পান করতুম। তারপর আমাদের মধ্যে সেদিনকার খবরের কাগজ নিয়ে আলোচনা চলত। তারপরেই সুরু হ'ত খেলা। হেমন্ত তাস-খেলাকে ঘৃণা করত। বলত, "ও হচ্ছে মেয়েলি খেলা!"

সেদিন আমার বোড়ের চালে হেমন্তের দাবা যখন অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত, তখন হঠাৎ মধু চাকর এসে খবর দিলে, "এক দঙ্গল পুলিসের লোক এসেছে।"

হেমন্ত একমনে দাবাকে বিপদ থেকে মুক্তি দেবার উপায়-চিন্তা করতে করতে বললে, "হ্যাঁ, তাঁদের জন্যে জলখাবারের ব্যবস্থা করতে হবে বৈকি!"

এই অসংলগ্ন কথা শুনে মধু হতভম্বের মতন মুখ ক'রে বললে, "কি বললেন বাবু?"

আমি হো-হো ক'রে হেসে উঠে বললুম, "ওহে কাদের-সাপওয়ালা, দাবাকে ছেড়ে মধুর কথা ভালো ক'রে শোনো! তুমি কাদের জন্যে জলখাবারের আয়োজন করতে বলছ?"

হেমন্ত মুখ তুলে বললে, "ঐ যে, মধু বললে না, কারা এসেছে? সকাল-বেলায় বাড়ীতে অতিথি এলে শুধু-মুখে ফিরিয়ে দিতে নেই!"

আমি আরো-জোরে অট্টহাস্য ক'রে বললুম, "মধু কি বলছে জানো ? এক দঙ্গল পুলিসের লোক এসেছে।"

বিপদগ্রস্ত দাবার দিকে একবার করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হেমন্ত বললে, "পুলিস ? কেন ?"

মধু বললে, "আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।"

খেলায় বাধা পড়ল ব'লে একটু বিরক্ত স্বরে হেমন্ত বললে, "কে দেখা করতে চায়, নিয়ে আয়।"

ঘরের ভিতরে এসে ঢুকলেন ধড়াচূড়াপরা একটি সুদীর্ঘ ভদ্রলোক। মুখে হাম-বড়াই ভাব। সুবৃহৎ ভুড়ি। তাঁকে আমি কোনদিন দেখিনি, তবে পোষাক দেখে বুঝলুম, তিনি কোন থানার ইন্‌স্পেক্টর।

হেমন্ত মৃদু হেসে বললে, "আসুন, নমস্কার! আপনি ভূপতিবাবু তো ? আপনাকে বোধহয় ইন্‌স্পেক্টার সতীশবাবুর সঙ্গে দেখেছি ?"

—"আমাকে ভোলেন নি ব'লে ধন্যবাদ ! হ্যাঁ, সতীশবাবুর পরামর্শেই আমি আপনার কাছে এসেছি।"

—"আমার এ সৌভাগ্যের কারণ কি ?"

—"ডাক্তার এম. সি. বিশ্বাসকে কাল রাত্রে কে বা কারা খুন ক'রে গেছে।"

হেমন্ত সবিস্ময়ে ব'লে উঠল, "বলেন কি, আবার ডাক্তার খুন !"

ভূপতিবাবু বললেন, "কেবল খুন নয়, এবারে আবার পাওয়া গিয়েছে সেই অদ্ভুত তাসের পাঞ্জা, তার তিনটে ফোঁটা কাটা !"

হেমন্ত কিছু বললে না, গুম্ হয়ে কি ভাবতে লাগল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "এবারেও কি ফোনেই ডাক্তার বিশ্বাসকে ডাকা হয়েছিল ?"

—"না, হত্যাকারী এবারে পদ্ধতি বদ্‌লেছে। সে নিজেই গাড়ী নিয়ে ডাক্তার বিশ্বাসকে ডাকতে এসেছিল।"

হেমন্ত বললে, "বোঝা যাচ্ছে, হত্যাকারী নির্ব্বোধ নয়। সে জানে, বার বার একই পদ্ধতিতে কাজ করলে তাকে ধরা পড়তে হবে।·········আচ্ছা ভূপতিবাবু, সব কথা আমাকে সংক্ষেপে বলতে আপনার আপত্তি নেই তো ?"

ভূপতিবাবু বললেন, "আপত্তি কি মশাই, আমি তো আপনার কাছেই সাহায্য-ভিক্ষা করতে এসেছি !"

—"আপনারা হচ্ছেন পাকা রুই-কাৎলা-জাতীয় পুলিস-কর্ম্মচারী। আমার মতন চুনো-পুঁটির কাছ থেকে আপনারা কি আশা করেন ?"

ভূপতিবাবু ডান হাত তুলে তাঁর ঝুলে-পড়া লম্বা গোঁফের প্রান্তে একবার মোচড় দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, আমরা হচ্ছি পেশাদার পুলিস, সখের গোয়েন্দাদের চেয়ে আমাদের অভিজ্ঞতার মূল্য যে বেশী, তাতে আর কোন সন্দেহই নেই। তবে কিনা, ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালীও শ্রীরামচন্দ্রের সেতু নির্ম্মাণে সাহায্য করেছিল, আর সতীশবাবুও বললেন, এ-সব ব্যাপারে আপনার মাথা নাকি খেলে ভালো, তাই আমার এখানে আসা।"

উচ্ছ্বসিত হাসি চাপতে চাপতে হেমন্ত বললে, "বেশ, বেশ, এসেছেন যখন, ভালো ক'রে বসুন। চা ইচ্ছা করেন ?"

ভূপতিবাবু নিজের বিপুল বপুখানি চেয়ারের উপরে ন্যস্ত করলেন, চেয়ার ক'রে উঠল আর্ত্তস্বরে প্রতিবাদ। তারপর বললেন, "চা, না চা-টা ?"

—"চা বলেন, টা বলেন, সবই আসতে পারে। 'টোষ্ট' তো আসবেই, তা ছাড়া সিদ্ধ ডিম, 'এগ্-পোচ্', 'ওম্লেট্'—এমন-কি হুকুম দিলে 'চিকেন্-স্যাণ্ড্উইচে'রও অভাব হবে না!"

একগাল হেসে ভূপতিবাবু বললেন, "বাহবা কি বাহবা! আপনার বাড়ীটি দেখছি তো লোভনীয়! এইজন্যেই সতীশবাবু আপনার এত ভক্ত—হুঁ, বুঝেছি! উত্তম, আপনি যে-সব পদার্থের নাম করলেন, আমি তার কোনটিকেই ছাড়তে রাজি নই!"

মধুকে ডেকে হেমন্ত খাদ্যতালিকা বুঝিয়ে দিলে।

ভূপতিবাবু বললেন, "আর দেখুন, এক 'কাপ্' চায়ে আমার গলা ভেজে না। আমার দেহখানি দেখছেন তো?"

—"নির্ভয় হোন, মধু চায়ের কেট্লিটাই এখানে এনে হাজির করবে।"

ভূপতিবাবুর দিকে একবার বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে মধু প্রস্থান করলে।

—"এইবারে ভূপতিবাবু, আপনার কাহিনী বলুন।"

—"আপাতত বলবার কথা খুব বেশী নেই।...হুঁ, শুনুন। কাল রাত প্রায় বারোটার সময়ে ডাক্তার এম. সি. বিশ্বাসের বাড়ীতে মস্ত একখানা মোটরে চ'ড়ে এক ভদ্রলোক আসেন।—"

—"ট্যাক্সি নয়?"

—"না, দারোয়ান বলে বাড়ীর গাড়ী। সাদা রং। ভদ্রলোক ডাক্তার বিশ্বাসকে তখনি যাবার জন্যে জেদ করেন। কেস হচ্ছে প্রসব-বেদনার, রোগিণী নাকি অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছে। ডাক্তার বিশ্বাস নারী-রোগে বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ, রাত্রে এ-রকম

কেস প্রায়ই তাঁর কাছে আসে। কিন্তু কাল তাঁর মোটরের কল বিগ্‌ড়ে গিয়েছিল ব'লে তিনি আগন্তুকের গাড়ীতেই চ'ড়ে রোগী দেখতে যান। তারপর আর তিনি বাড়ীতে ফেরেন নি।"

—"আগন্তুক ঠিকানা দিয়েছিল ?"

—"হয়তো ডাক্তার বিশ্বাসের কাছে দিয়েছিল, কিন্তু আর কেউ জানে না।"

—"তার চেহারার বর্ণনা পেয়েছেন ?"

—"ডাক্তার বিশ্বাসের দরোয়ানের কাছে পেয়েছি। লোকটা বয়সে বুড়ো, তার মাথায় লম্বা পাকা চুল, মুখে পাকা গোঁফ-দাড়ী, চোখে ধোঁয়াটে রঙের চশমা, পরোণে সেকেলে লম্বা কোর্ত্তা আর কাপড়, পায়ে সাদা ক্যাম্বিসের জুতো। সে চলে ধনুকের মত দুম্‌ড়ে, খুব কুঁজো হয়ে। দরোয়ান এ ছাড়া আর কিছু বলতে পারে নি।"

—"আগন্তুকের গাড়ী চালাচ্ছিল কে ? সে নিজে, না ড্রাইভার ?"

—"ড্রাইভার।"

—"আপনারা খুনের কথা কখন্ জানতে পারেন ?"

—"কাল রাত দুটোর সময়ে। বাগবাজারের খালের ধার দিয়ে আসতে আসতে এক কুলি সর্ব্বপ্রথমে ডাক্তার বিশ্বাসের লাস দেখতে পায়। সে তখনি ঘাঁটির পাহারাওয়ালাকে খবর দেয়। তারপর খবর পাই আমরা। মৃতদেহটা খালের ধারে খুব নির্জ্জন এক জায়গায় প'ড়ে ছিল—তার বুকে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন। লাসের পাশেই ছিল তাসের পাঞ্জা।"

—"লাস কি সরিয়ে ফেলা হয়েছে ?"

—"না। একে রাত তায় 'ব্ল্যাক-আউটে'র দিন, আমরা

এখনো লাস ভালো ক'রে পরীক্ষা করিনি। জানেন তো, কাল সন্ধ্যার সময়ে বেশ খানিকক্ষণ বৃষ্টি হয়েছিল, লাসের চারিদিকের ভিজে জমির কাদার উপরে দেখলুম অনেক পায়ের দাগ। আজ সকালে সমস্ত মন দিয়ে দেখব ব'লে, একটা সেপাইকে পাহারায় বসিয়ে লাস সেইখানেই রেখে এসেছি।"

—"বেশ করেছেন। ঐ মধু চা আর টা এনেছে, চট্‌পট্ আপনার কর্ত্তব্য সেরে নিন্।"

আহার্য্যগুলোর উপরে একবার লুব্ধ দৃষ্টি বুলিয়ে ভূপতিবাবু বললেন, "আমার কিছুমাত্র দেরি হবে না হেমন্তবাবু! আমি লিলিপুটের পুঁচকে বাসিন্দা নই, এ ক'খানা ডিস্ তো আমার পক্ষে নস্য!"

সত্যই তাই! আমরা দুজনে সবিস্ময়ে দেখলুম, ভূপতিবাবু এক-একবার আকর্ণবিশ্রান্ত হাঁ করেন, আর এক-একটা ডিম, 'এগ্-পোচ্', 'ওম্‌লেট্', 'স্যাণ্ডউইচ্' ও 'টোস্ট্' একেবারে তাঁর গলদেশের তলদেশে তলিয়ে যায়! দুই-তিন চুমুকে এক-এক পেয়ালা চা সাবাড়! তিন পেয়ালা চা উড়িয়ে তিনি মুখ মোছবার জন্যে রুমাল বার করলেন।

হেমন্ত বললে, "রবীন, প্রথম ডাক্তার খুন হয় কবে?"

—"একুশে জুলাই।"

—"হুঁ। দ্বিতীয় খুন হয় আটাশে জুলাই। আর কাল গেছে আগষ্ট মাসের চার তারিখ। জুলাই মাস শেষ হয় একত্রিশ তারিখে।"

—"তুমি কি হিসেব করছ?"

—"কিছু না! এখন ওঠ, ভূপতিবাবুর আহার-পর্ব্ব সমাপ্ত।"

তিন

তদন্ত

ডাক্তার বিশ্বাসের মৃতদেহ যে-জায়গায় পড়েছিল, তার খুব কাছেই বাগবাজারের খাল। কলকাতার এই উত্তর-সীমান্তে আজকাল আংশিক 'ব্ল্যাক-আউটে'র রাতে বারোটার পর লোক-চলাচল একরকম বন্ধ হয়ে গিয়েছে বললেই হয়। এ-রকম জায়গায় খুন বা রাহাজানির সুবিধা যথেষ্ট।

যে-সেপাই পাহারা দিচ্ছিল, ভূপতিবাবু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "লাসের কাছে কেউ আসে নি তো?"

পাহারাওয়ালা বললে, "না হুজুর।"

—"আসুন হেমন্তবাবু, তাহ'লে আমাদের পরীক্ষা সুরু করা যাক্। আগে লাস দেখবেন, না পায়ের দাগ?"

—"পায়ের দাগ।"

—"বেশ, আমরা দুজনেই দেখি আসুন। পরে আলোচনা করা যাবে।"

দুজনেই মাটির উপরে হেঁট হয়ে পায়ের দাগ পরীক্ষায় নিযুক্ত হ'ল, আমি একটু তফাতে দাঁড়িয়ে কাপড়ে-ঢাকা মৃত দেহের দিকে সভয়ে তাকিয়ে রইলুম। আমি হচ্ছি সাহিত্যিক, গল্প ও কবিতা লেখা আমার কাজ—নরহত্যা ও ডাকাতি প্রভৃতি হচ্ছে আমার কাছে কল্পনাতীত, অমানুষিক ব্যাপার। ঐ কাপড়ের তলায় যে ক্ষত-বিক্ষত ও জীবনহীন জীবের দেহটা

ভয়াবহ ভাবে আড়ষ্ট হয়ে আছে, আমার কাব্যপ্রিয় কোমল মন সেটা ভেবেই শিউরে শিউরে উঠতে লাগল।

মিনিট-কয়েক পরেই ভূপতিবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ব্যাস্, আমার এ পেশাদার চোখ যা দেখবার, সব দেখে নিয়েছে! হেমন্তবাবু, আপনার আর কত দেরি?"

হেমন্ত একবার মুখ তুলে হেসে বললে, "এ-সব কাজে আমি হচ্ছি নাবালক মাত্র, আমার দেখা শেষ হ'তে সময় লাগবে।" ব'লেই সে একখানা 'ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস' ও একটা 'ফুট' বার ক'রে আবার জমির উপরে উপুড় হয়ে পড়ল।

—"আরে মশাই, অত তোড়জোড় করছেন কেন, এ যে মশা মারতে কামান পাতা! এখানে এমন-কিছু উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য নেই! ঐ তো সখের গোয়েন্দাদের বিটকেল বাতিক —বজ্র আঁটন, ফস্কা গেরো!"

হেমন্ত নিরুত্তর মুখে নিজের কাজেই নিযুক্ত হয়ে রইল।

শেষটা ভূপতিবাবু যখন রীতিমত অধীর হয়ে মৃতদেহের দিকে অগ্রসর হয়েছেন, হেমন্ত তখন গাত্রোত্থান ক'রে বললে, "আপনি এখানে কি দেখেছেন ভূপতিবাবু?"

—"যা দেখা যায়! তিন-জোড়া পায়ের দাগ। তার মধ্যে এক-জোড়া দাগ খালি-পায়ের।"

—"মাপ করবেন, ঠিক হ'ল না। এখানে চারজন মানুষের পদচিহ্ন আছে।"

—"প্রমাণ?"

—"বলছি। খালি-পায়ের চিহ্ন ছেড়ে দিন! ওগুলো নিশ্চয়ই সেই কুলির, যে সর্ব্বপ্রথমে লাস আবিষ্কার করেছে।"

—"কি ক'রে জানলেন?"

—"খালি-পায়ের চিহ্নগুলো ভালো ক'রে দেখুন। নানা স্থানে এগুলো জুতোর দাগের উপর গিয়ে পড়েছে। তার কারণ, জুতোর মালিকরা এখানে পদচিহ্ন ফেলে চ'লে যাবার পরেই কুলিটা ঘটনাস্থলে এসেছিল। সে প্রথমে স্বাভাবিক ভাবে পা ফেলে এখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। তারপর লাস দেখে সভয়ে দীর্ঘ পদবিক্ষেপ ক'রে প্রাণপণে ছুটে পালায়—দেখুন, খালি-পায়ের চিহ্নগুলো এদিকে কত তফাতে তফাতে পড়েছে!"

—"হুঁ, হয়তো আপনার কথাই সত্যি। কিন্তু আর তিনজন লোকের পায়ের দাগ কোথায়?"

—"ভূপতিবাবু, আমি 'ফুট' দিয়ে মেপে এখানে তিন-জোড়া জুতো-পরা পায়ের দাগ পেয়েছি। একজোড়া জুতোর মাপ লম্বায় কিছু-কম নয় ইঞ্চি আর চওড়ায় কিছু-বেশী তিন ইঞ্চি, আর-একজোড়া জুতোর মাপ লম্বায় নয় ইঞ্চি আর চওড়ায় সওয়া তিন ইঞ্চি। হঠাৎ দেখলে এই দুজোড়া পায়ের দাগ প্রায় একরকম ব'লে মনে হয়—মেপে না দেখলে আমারও ভ্রম হ'তে পারত।"

—"আর-একজোড়া পায়ের দাগ সম্বন্ধে আপনার কি মত?"

—"পরে বলছি। আগে দেখা যাক্, এই দুজন লোক এখানে এসে কি ক'রেছিল? দেখুন, ডানদিক হ'তে পরস্পরের কাছ থেকে প্রায় আড়াই ফুট তফাতে তফাতে থেকে এরা যে এখানে এসেছে, এই পায়ের দাগগুলো দেখে সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। এই ভাবে আসবার সময়ে তাদের পদচিহ্নগুলো খুব গভীর ভাবে কাদার ভিতরে ব'সে গিয়েছে। আবার, এই উল্টোমুখো পদচিহ্নগুলোর উৎপত্তি হয়েছে তখন, তারা যখন এখান থেকে ফিরে গিয়েছে; এ দাগগুলো গভীরও নয়,

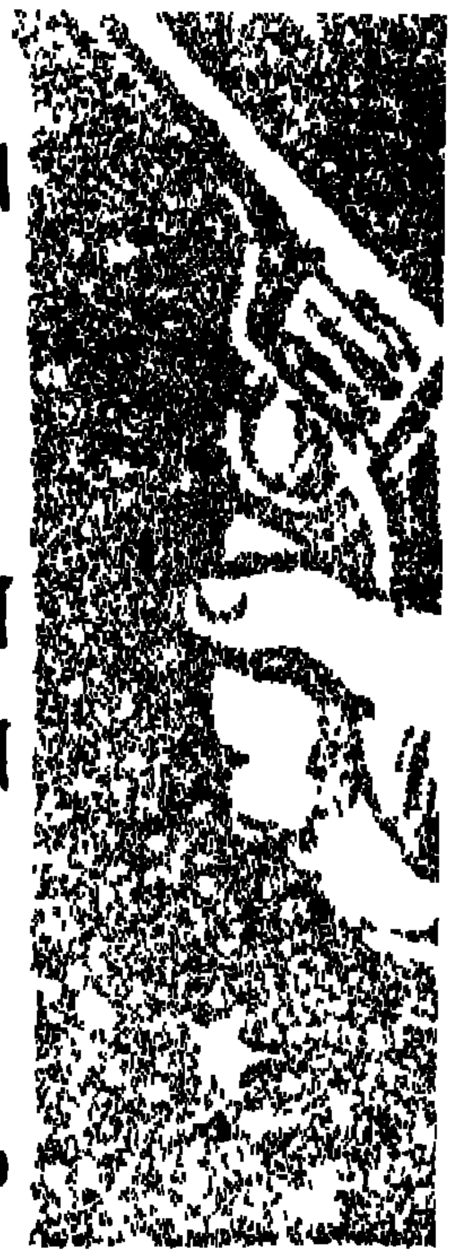

পরস্পরের কাছ হ'তে মাপ-করা দূরে-দূরেও থাকে নি। এথেকে কি প্রমাণ হয় বলুন।"

—"আপনিই বলুন না!"

—"ওদের পা আসবার সময়ে এমন গভীর [illegible] কাদার ভিতরে ব'সে গিয়েছিল কেন জানেন? ওরা কোন ভারি জিনিষ বহন ক'রে এনেছিল।"

—"তার মানে?"

—"এক্ষেত্রে ভারি জিনিষ মানে আর কি হ'তে পারে? ডাক্তার বিশ্বাসের মৃতদেহ!"

ভূপতিবাবু সচকিত স্বরে বললেন, "তাহলে আপনি কি বলতে চান, ডাক্তার বিশ্বাসকে এখানে খুন করা হয় নি?"

—"আমার তো সেইরকম সন্দেহ হয়।"

ভূপতিবাবু তাড়াতাড়ি মৃতদেহের দিকে অগ্রসর হ'লেন, হেমন্ত তাঁকে বাধা দিয়ে বললে, "পদচিহ্নের ইতিহাস আর-একটু বাকী আছে। এখানে চতুর্থ যে ব্যক্তির পায়ের দাগ দেখছি, সে কিঞ্চিৎ অসাধারণ।"

—"কি-রকম?"

—"সে মাথায় অন্তত ছয় ফুট উঁচু। সে হয়তো ন্যাটা, —অর্থাৎ ডানহাতের কাজ করে বাঁ হাত দিয়ে।"

—"পায়ের দাগের ভিতর থেকে আপনি এই অপূর্ব্ব আবিষ্কার করেছেন?" ব'লেই ভূপতি হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন।

হেমন্ত কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বললে, "তার হাতে ছিল একগাছা মস্ত মোটা লাঠি।"

—"আর তার ডান চোখ ছিল কাণা, আর বাঁ গালে ছিল একটা জড়ুল! কি বলেন?"

—"না, অতটা বেশী বলতে পারি না। এইবারের যা বলেছি তার ব্যাখ্যা শুনুন। প্রথমত, এই পায়ের দাগগুলো লক্ষ্য ক'রে দেখুন। এদের প্রত্যেকটার মাপ কত জানেন? লম্বায় প্রায় এগারো ইঞ্চি আর চওড়ায় চার ইঞ্চিরও বেশী। যার পা এত বড়, তার বেঁটে হওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয়, প্রত্যেক পদচিহ্নের মাঝখানে কতখানি ক'রে ফাঁক রয়েছে দেখছেন? রীতিমত দীর্ঘ লোক ছাড়া কেউ এত তফাতে তফাতে পা ফেলে না।"

—"আচ্ছা, এটাও যেন মেনে নিলুম। কিন্তু কি ক'রে জানলেন সে ন্যাটা আর মোটা লাঠি নিয়ে বেড়ায়?"

—"খুব সহজেই। ভালো ক'রে দেখলে আপনিও বলতে পারতেন!......চেয়ে দেখুন! কাদার ওপরে প্রত্যেক বাঁ-পায়ের দিকে একটা ক'রে গোল চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন?"

—"হুঁ।"

—"ওগুলো হচ্ছে লাঠির দাগ! চিহ্নগুলোর আকার দেখে বলা যায় লাঠিগাছা বেশ মোটা। ঐ পদচিহ্নের অধিকারী যদি আর পাঁচজনের মত ডানহাতে লাঠি ধরত, তাহ'লে মাটিতে লাঠির দাগ পড়ত ডান পায়ের দিকে। এখানে তা পড়ে নি ব'লেই বলছি, হয়তো সে ন্যাটা।"

ভূপতিবাবু চমৎকৃত ভাবে হেমন্তের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "মশাই, আমাকে মাপ করুন। এতক্ষণ পরে বুঝলুম, আমাদের সতীশবাবু আপনার প্রশংসায় কেন এমন পঞ্চমুখ!"

হেমন্ত বললে, "এইবারে মৃতদেহে হস্তার্পণ করা যাক্!"

...আমি লিলিপুটের পুঁচকে বাসিন্দা নই, এ ক'খানা ডিস্ তো আমার পক্ষে নয়!...

—১৬ পৃষ্ঠা

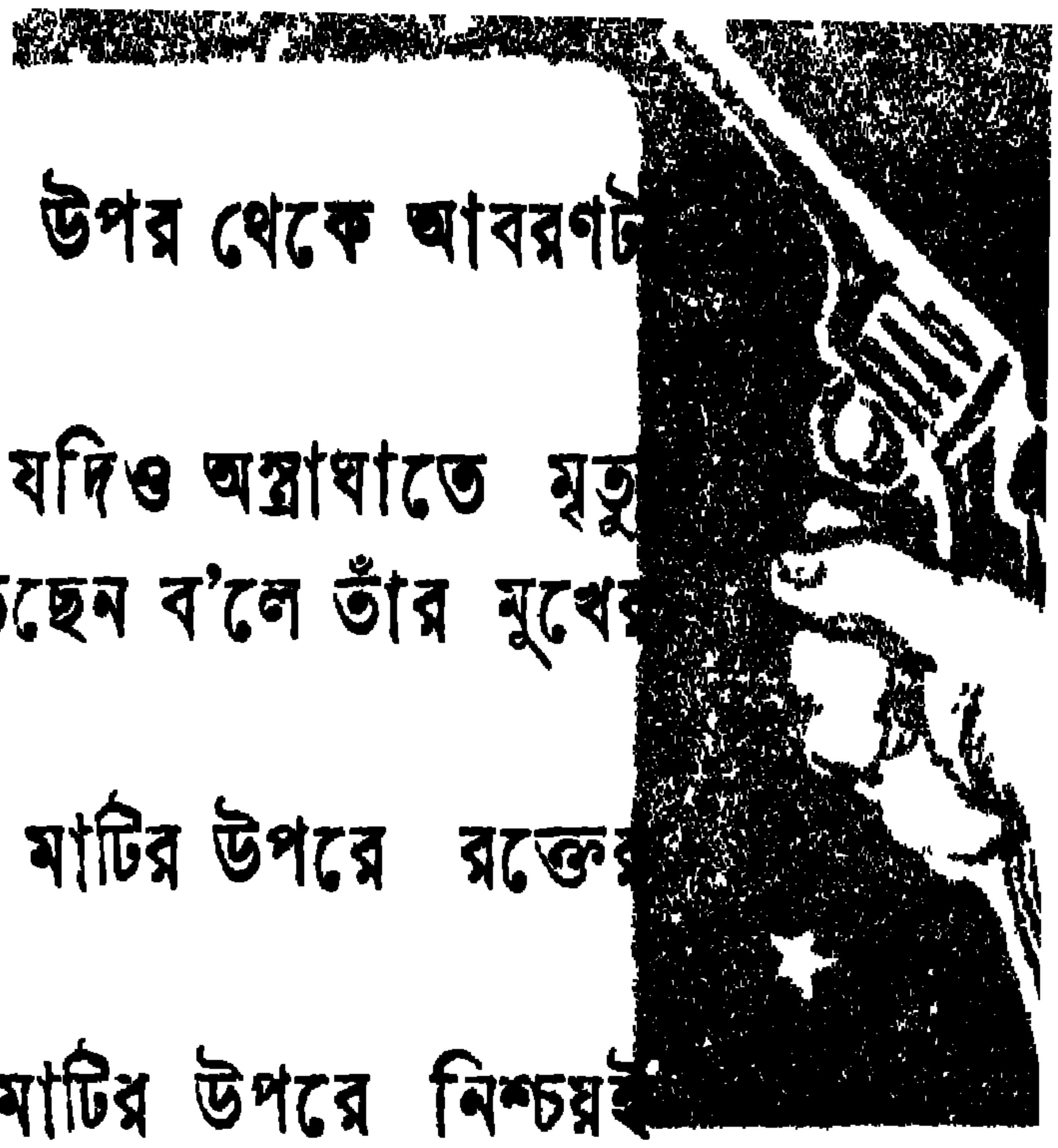

ভূপতিবাবু এগিয়ে গিয়ে মৃতদেহের উপর থেকে আবরণটা তুলে নিলেন।

একটি প্রৌঢ় ব্যক্তির মৃতদেহ। যদিও অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হয়েছে, তবু অনেকক্ষণ আগে মারা পড়েছেন ব'লে তাঁর মুখের ভাব আবার প্রশান্ত হয়ে এসেছে।

হেমন্ত বললে, "দেখছেন ভূপতিবাবু, মাটির উপরে রক্তের দাগ নেই?"

—"না। এখানে হত্যাকাণ্ড হ'লে মাটির উপরে নিশ্চয়ই রক্তের দাগ থাকত। আপনি ঠিক অনুমান করেছেন। ভদ্রলোককে মারা হয়েছে অন্য জায়গায়। কিন্তু কোথায়!"

—"হয়তো গাড়ার ভিতরেই!"

—"হ'তেও পারে, না হ'তেও পারে।"

—"ডাক্তার বিশ্বাসের বাড়ী কোথায়?"

—"কালীঘাটের কাছে।"

—"আর এটা হচ্ছে বাগবাজারের খালের ধার। গভীর রাত্রি, রাস্তায় আধা-অন্ধকার, পথিক নেই, সুদীর্ঘ পথ, দ্রুতগামী মোটর। হত্যাকারী কাজ সারবার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিল! তারপর একটি নিরাপদ জায়গা বেছে নিয়ে লাস ফেলে দিয়ে তারা স'রে পড়েছে।"

—"অসম্ভব নয়।"

হেমন্ত এগিয়ে গিয়ে দেহের দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল নীরবে। তারপর যেন নিজের মনেই বললে, "বুকের উপরে দু-জায়গায় অস্ত্রের দাগ। কিন্তু কোন্ অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে?"

ভূপতিবাবু বললেন, "শব-ব্যবচ্ছেদাগারের পরীক্ষায় জানা

ায়েছে, এর আগের দুই ডাক্তারেরই হত্যাকাণ্ডে ব্যবহার করা য়েছে, পেন্সিল-কাটা ছুরির মতন সরু কোন অস্ত্র! তবে তার লাটা ছুরির চেয়ে বেশী লম্বা।"

হেমন্ত আঙুল দিয়ে শুকনো রক্তের চাপ সরিয়ে মৃতদেহের তস্থান পরখ ক'রে বললে, "হ্যাঁ, যে অস্ত্রের আঘাতে ডাক্তার বিশ্বাসের মৃত্যু হয়েছে, তারও ফলা পেন্সিল-কাটা ছুরির চেয়ে চওড়া নয়।"

ভূপতিবাবু বললেন, "আচ্ছা, আপনি যে বললেন এখানে তিনজোড়া জুতো-পরা পায়ের চিহ্ন দেখেছেন, তাদের মধ্যে ডাক্তার বিশ্বাসের পায়ের দাগ নেই তো?"

—"অসম্ভব। কাপড়ের তলা থেকে মৃতদেহের পা বেরিয়ে ছিল। আমি আগেই লক্ষ্য ক'রে দেখেছি, ডাক্তার বিশ্বাসের জুতোর তলায় একটুও কাদার চিহ্ন নেই, সুতরাং এখানকার জমির উপরে তিনি পদার্পণও করেন নি!"

—"আমার মনে হয়, মৃতদেহের ভিতর থেকে আর নতুন কিছু আবিষ্কারের সম্ভাবনা নেই।"

—"আপনি লাসের কাপড়-জামা পরীক্ষা করেছেন?"

—"হ্যাঁ, কাল রাতেই। পকেট-বুক, মণিব্যাগ, সোনার হাতঘড়ী—কিছুই হারায় নি। এ হত্যাকাণ্ডেরও কারণ অর্থলোভ নয়। আর কেন, এইবারে লাস সরিয়ে ফেলতে হুকুম দি—কি বলেন?"

হেমন্ত জিজ্ঞাসার কোন জবাব না দিয়ে আবার যেন নিজের মনেই বললে, "মৃতদেহের বুকের উপরে পাশাপাশি দুটো ক্ষত-চিহ্ন! ডাক্তার বিশ্বাস তাহ'লে প্রথম আঘাতেই মরেন নি—হয়তো হত্যাকারীর সঙ্গে দু-এক মুহূর্ত্ত ধ্বস্তাধ্বস্তি করেছিলেন!"

—"কিন্তু ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রেও বাঁচতে পারেন নি!"

হেমন্ত হঠাৎ মৃতদেহের মুষ্টিবদ্ধ ডানহাতখানা তুলে ধরলে। তারপর জোর ক'রে মুষ্টি খুলে বার করলে একগোছা পাকা চুল। বললে, "ভূপতিবাবু, এই দেখুন ধ্বস্তাধ্বস্তির ফল!"

—"হত্যাকারীর মাথার পাকা চুল ?"

হেমন্ত আবার 'ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস' বার ক'রে চুলগুলো দেখতে দেখতে একটু হেসে বললে, "না ভূপতিবাবু, এ হচ্ছে মরা চুল!"

—"সে আবার কি ?"

—"অর্থাৎ পরচুল।"

—"অ্যাঁ ?"

—"হ্যাঁ! ডাক্তার বিশ্বাসের দরোয়ান যে-বৃদ্ধকে দেখেছিল, খুব-সম্ভব তারই মাথায় আর মুখে ছিল পরচুল। হত্যাকারী হয়তো বয়সে যুবক, আত্মগোপন করবার জন্যে সে গিয়েছিল ছদ্মবেশে। পদচিহ্ন দেখে আমি যে সুদীর্ঘ ব্যক্তিকে আবিষ্কার করেছি, সেই হয়তো পাকা পরচুল প'রে বুড়ো সেজেছিল। আর নিজের দীর্ঘতা লুকোবার জন্যেই কুঁজো হয়ে দুমড়ে প'ড়ে চলা-ফেরা করেছিল।"

—"দরোয়ানের আর-একটা কথার সঙ্গে আপনার কথা মিলছে না।"

—"কি ?"

—"আপনি বলছেন হত্যাকারীদের দলে ছিল তিন জন লোক। দরোয়ান বলে গাড়ীতে ড্রাইভার আর সেই বৃদ্ধ ছাড়া আর কেউ ছিল না।"

—"নিশ্চয়ই ছিল। অন্ধকারে দরোয়ান গাড়ীর ভিতরটা

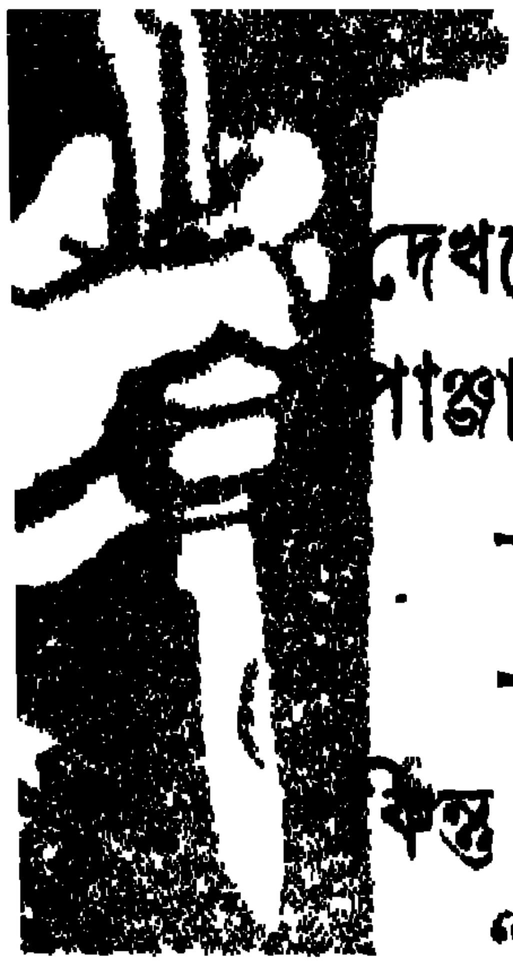

দেখতে পায় নি। যাক্, এটা খুব বড় কথা নয়। সেই তাসের পাঞ্জা এখানে দেখতে পাচ্ছি না কেন ?”

—“সেখানা কালই আমি নিয়ে গিয়েছি !”

—“ভূপতিবাবু, এখানে আমার আর কোন কর্ত্তব্য নেই, কিন্তু আপনার কিছু কাজ এখনো বাকি আছে।”

“—আবার কি কাজ ?”

—“ঐ তিনজোড়া জুতো-পরা পদচিহ্নের প্লাষ্টারের ছাঁচ্ তোলবার ব্যবস্থা করুন। পরে কাজে লাগতে পারে।”

—“তা যেন করব, কিন্তু আপনি এই হত্যার উদ্দেশ্য কিছু ধরতে পারলেন কি ?”

—“আমি যাদুকর নই ভূপতিবাবু, এত তাড়াতাড়ি অতটা পারি না। আচ্ছা, নমস্কার ! এস রবীন !”

চার

চতুর্থ আক্রমণ

এর পর কয়েকদিন কেটে গেল। অদ্ভুত হত্যাকাণ্ডগুলো সম্বন্ধে হেমন্ত আর কোন কথাই তুললে না। আমি তার স্বভাব জানতুম। সে যখন কোন বিষয় নিয়ে গভীর চিন্তা করে এবং সে-সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে না পারে, তখন তা নিয়ে কেউ কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলে অত্যন্ত চ'টে যায়। কাজেই আমি কিছুই জানবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলুম না।

কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা চলছে ঠিক একভাবেই। হেমন্ত সম্পূর্ণ সহজ ভাবেই চা ও 'টা' খেত, খবরের কাগজ নিয়ে আলোচনা করত, দাবা খেলত, আমার সঙ্গে বেড়াতে বেরুতো, নিজের লাইব্রেরীতে ব'সে বই পড়ত বা রসায়নাগারে ঢুকে নানা পরীক্ষায় নিযুক্ত হয়ে থাকত। বাহির থেকে দেখলে কেহই ভাবতে পারত না যে, তার মনে অন্য কোন ভাবনা আছে। কিন্তু আমি তাকে খুব চিনি! আমি বেশ জানি অন্য কোন কাজের সঙ্গেই এখন তার মস্তিষ্কের সত্যিকার যোগ নেই—সে লোকের চোখের সামনে করছে এক কাজ, কিন্তু তার মনের মধ্যে বাস করছে অন্য চিন্তা! যতদিন না সমস্যার সমাধান হবে ততদিন তার এই ভাবেই যাবে! অর্থাৎ যা নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছে তা নিয়ে কোনই উচ্চবাচ্য করবে না!

এ-সময়টায় তার প্রকৃতিরও কতকটা পরিবর্ত্তন হ'ত। ভাবত তার প্রকৃতি সরস ও মধুর। কিন্তু কোন বিষয় নিয়ে ন্তায় নিযুক্ত থাকলে এবং মীমাংসায় উপস্থিত হ'তে না পারলে স হয়ে উঠত অত্যন্ত রূঢ়ভাষী এবং কথায় কথায় বাধিয়ে দিত সাতল-কাণ্ড। কাজেই যাতে তার চিন্তা-সূত্র ছিঁড়ে না ায়, সেজন্যে আমাদের সর্ব্বদাই সাবধান হয়ে থাকতে হ'ত।

কিন্তু পুলিসের ভূপতিবাবু তো এত শত জানতেন না, তিনি বার বার ফোন্ ক'রে, লোক পাঠিয়ে এবং নিজে আনা-গোনা ক'রে হেমন্তকে মহা-জ্বালাতন ক'রে তুললেন। হেমন্ত শেষটা অসুস্থতার ভাণ ক'রে তাঁর বা তাঁর লোকের সঙ্গে দেখা করত না।

আজ ক'দিন পরে হেমন্তকে বেশ প্রফুল্ল দেখছি। সে দুখানার বদলে তিনখানা 'টোষ্ট' নিলে, ডবল-ডিমের ওম্‌লেট্ও চাইলে দুইবার—তার এই ক্ষুধাবৃদ্ধি নিশ্চিন্ততার লক্ষণ!

আমি ঠাট্টার সুরে বললুম, "কিহে ভায়া, তুমিও মহাজন ভূপতিবাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চাও নাকি?"

হেমন্ত ব'লে উঠল, "অসম্ভব! আমি চেষ্টা করলে হয়তো তোমার মতন সাপ্তাহিক কাগজের কবি হয়ে উঠতে পারি, কিন্তু হাজার বার মাথা খুঁড়লেও একবারের জন্যেও ভূপতিবাবুর মতন উদর-পিশাচ হ'তে পারব না!"

চা-পানের পর খবরের কাগজ পড়া। তারপর দাবা-খেলার পালা।

অভ্যাস-মত আমি দাবার ছকের দিকে হাত বাড়াতেই হেমন্ত ইজি-চেয়ারে চিৎ হয়ে প'ড়ে, দুই হাতলে দুটো পা

তুলে দিয়ে বললে, "আজ আর খেলা নয় রবীন, আজ খা...
গল্প!"

আমি একেবারে আসল কথা পেড়ে বললুম, "ওঃ, আজ ...
দেখছি ভারি ফূর্ত্তি! ভূপতিবাবুর 'কেস্'টার কোন কিনার...
করতে পেরেছ বুঝি?"

হেমন্ত মাথা নেড়ে বললে, "এরি মধ্যে কিনারা কি হে...
তুমি কি আমাকে অসাধ্যসাধন করতে বল? নদীতে ঝাঁ...
দেওয়ার মানেই কি নদী পার হওয়া? আমি বেশ বুঝতে...
পারছি, পুলিস জলে ঝাঁপ দিয়েছে সাঁতার-না-জানা লোকের মত, কাজেই হাবুডুবু খেয়ে মরছে; আমি একটু-আধটু সাঁতার জানি, তাই বড়-জোর বলতে পারি যে, প্রায় মাঝ-নদীতে এসে পড়েছি। কিন্তু কিনারা? নদীর কিনারা এখনো অনেক দূরে ভাই, অনেক দূরে!"

আমি চেয়ারখানা হেমন্তের আরো কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে বললুম, "সাঁতার দিয়ে তুমি মাঝ-নদীতে এসে পড়েছ তো? বেশ, তোমার সাঁতার-কাহিনী শুনতে চাই।"

—"এখনো বলবার সময় হয় নি। কারণ নদীর ওপার এখনো চোখে দেখতে পাচ্ছি না। তবে আমার একটা নিরাশার কাহিনী শোনো। আজ আগস্ট মাসের কত তারিখ?"

—"বারোই।"

—"আমার কি ধারণা হয়েছিল জানো? আজ সকালে খবরের কাগজে কোন রোমাঞ্চকর খবর ছাপা হবে—কারণ কাল গিয়েছে এগারো তারিখ। কিন্তু আমাকে হতাশ হ'তে হয়েছে।"

আমি চকিত স্বরে বললুম, "তুমি কি-রকম রোমাঞ্চকর খবরের প্রত্যাশা করছিলে?"

—"বলব না। অর্থাৎ ব'লে বোকা বনব না। মনে মনে অনেক তোলাপাড়া ক'রে আমি কতকগুলো সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছিলুম। কিন্তু আজ দেখছি তার মধ্যে একটি সিদ্ধান্ত একেবারে বাজে! রবীন, আমার আত্মশ্লাঘায় ঘা লেগেছে! আমার কাছ থেকে তুমি আর কিছু জানতে চেও না। এ মামলায় আমার অন্য সিদ্ধান্তগুলোও হয়তো এমনি বাজে হয়ে দাঁড়াবে। আমি প্রকাশ্যে বোকা বনতে ভালোবাসি না।"

টেবিলের উপরে দু'খানা প্রকাণ্ড আকারের ইংরেজী গ্রন্থ প'ড়েছিল—Encyclopedia of Good Health বা Home Doctor! আজ ক'দিন ধ'রে দেখছি হেমন্ত এই বইখানা নিয়ে বার বার নাড়াচাড়া করছে। আমিও তার একখণ্ড নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগলুম।

খানিক পরেই হেমন্ত যেন আপন মনেই বললে, "এদেশের অপরাধীরা 'রোমান্টিক' বা উৎকট কল্পনারসিক হ'তে পারে না কেন, এই ভেবে মাঝে মাঝে আমার ভারি দুঃখ হয়। তারা কেবল লোভ বা হিংসা বা রাগের বশেই খুনখারাপি করে, ওর মধ্যে কিছুমাত্র 'রোমান্স' নেই। য়ুরোপে গিয়ে দেখেছি, সেখানে 'রোমান্টিক' অপরাধীর ছড়াছড়ি।"

আবার কথা কইবার সুযোগ পেয়ে আমি বই থেকে মুখ তুলে বললুম, "তুমি কি-রকম অপরাধীর কথা বলছ হেমন্ত?"

—"ধর, অমর হত্যাকারী জ্যাক্ দি রিপারের কথা। বিলেতে যখন তাকে ধরবার জন্যে চারিদিকে জাল ফেলা আর পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, তখন পুলিসের বড় সাহেবের কাছে জ্যাক হঠাৎ একখানা চিঠি লিখে জানালে যে, 'অমুক জায়গায় অমুক সময়ে গেলে তুমি আমার দেখা পাবে।' বলা

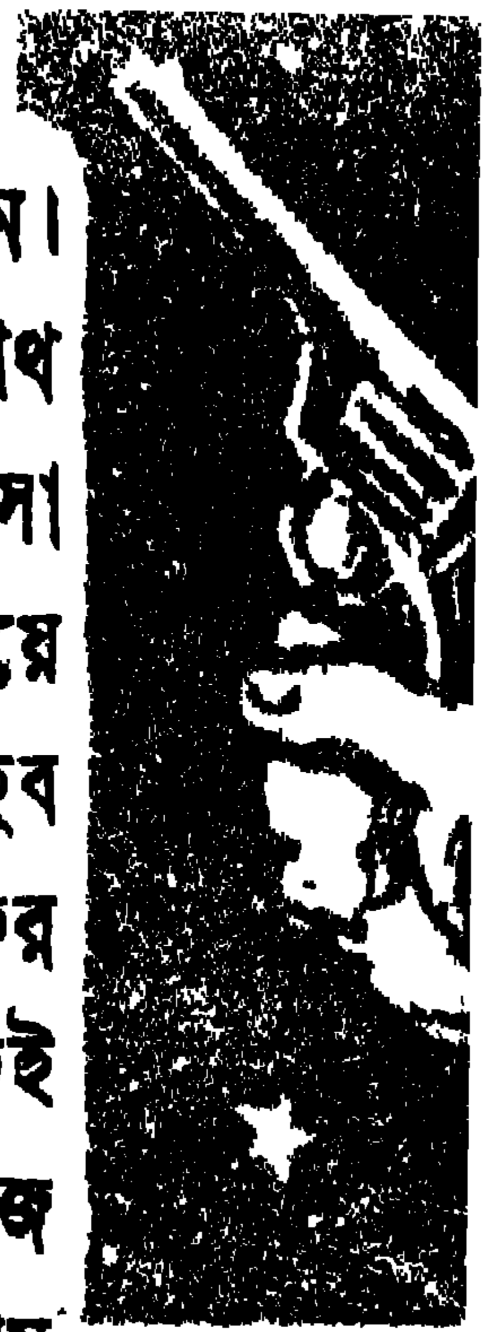

বাহুল্য, বড়-সাহেব যথাসময়ে যথাস্থানে গিয়ে হাজির হ'লেন। রাজপথে লোকারণ্য। হঠাৎ একজন অতি সাধারণ পথিক পথ চলতে চলতে তাঁর সামনে থেমে প'ড়ে একটা ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলে। বড়-সাহেব কোনরকম সন্দেহের কারণ না পেয়ে তাকে ঠিকানা ব'লে দিলেন। পথিক চ'লে গেল। বড়-সাহেব নিজের ঘড়ী বার ক'রে দেখলেন, ঠিক এই সময়েই জ্যাকের আসবার কথা। তখন তাঁর চমক ভাঙল, বুঝলেন ঐ পথিকই জ্যাক ছাড়া আর কেউ নয়! তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর খোঁজে ছুটলেন—কিন্তু জ্যাক তখন ভিড়ের ভিতরে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে!···রবীন, একেই বলি আমি 'রোমান্টিক ক্রিমিন্যাল'! হ্যাঁ, সেকালে এদেশেও এই শ্রেণীর অপরাধী ছিল। বিশু ডাকাত, তান্তিয়া ভিল প্রভৃতির গল্প প'ড়ে দেখো, রীতিমত 'রোমান্সে'র গন্ধ পাবে!"

আমি বললুম, "হঠাৎ 'রোমান্টিক' অপরাধীদের নিয়ে তোমার এত মাথাব্যথা কেন বল দেখি?"

—"কারণ, যে মামলা হাতে পড়েছে, তার মধ্যে কিঞ্চিৎ 'রোমান্সে'র আঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে।"

—"যথা?"

—"এই তাসের পাঞ্জার কথা ভেবে দেখ। যেখানে খুন হয় সেখানেই পাওয়া যায় একখানা ক'রে পাঞ্জা—আর তার এক-একটা ঘর কাটা! তুমি বলবে একে রহস্যময়, আমি বলব 'রোমান্টিক'!"

—"এর মধ্যে কি আর কোন অর্থ নেই?"

—"নিশ্চয়ই আছে! খানিক খানিক অনুমান করতেও পেরেছি, কিন্তু এখনো রহস্যোদ্ঘাটনের সময় হয় নি।"

হেমন্ত আবার মুখে লাগালে তালা-চাবি। আমিও আবার ঝুঁকে পড়লুম কেতাবের দিকে। এইভাবে গেল মিনিট-পনেরো।

তারপর হেমন্ত বললে, "যদি এই মামলার একটা কিনারা হয়, তাহ'লে ঐ তাসের পাঞ্জাগুলোকে স্মরণীয় করবার জন্যে এখানকার পুলিস-কর্ত্তৃপক্ষ কিছুই করবে না। কিন্তু য়ুরোপের ধারা স্বতন্ত্র।"

আমি বললুম, "য়ুরোপের পুলিস ঐ তাসের পাঞ্জা নিয়ে কি করত?"

—"মিউজিয়মে সাজিয়ে রাখত।"

—"মিউজিয়মে?"

—"হ্যাঁ, Museum of Crime বা অপরাধের যাদুঘর! আমি যখন অপরাধ-তত্ত্ব শেখবার জন্যে কালাপানি পার হয়েছিলুম, তখন ইংলণ্ডের, ফ্রান্সের আর অষ্ট্রিয়ার রাজধানীতে দেখেছিলুম এইরকম সব মিউজিয়ম—সাধারণ লোকের জন্যে নয়, কেবল পুলিস-বিভাগের জন্যে। তাদের মধ্যে সাজানো আছে নানা বিখ্যাত মামলার অসাধারণ আর উল্লেখযোগ্য জিনিষ। সে-সব দেখলে অপরাধীদের মনোবৃত্তির বিষয়ে কতই শিক্ষা পাওয়া যায়! অনেক জিনিষ হয়তো খুবই তুচ্ছ—কিন্তু তাদের পিছনে আছে হয়তো এমন ভয়াবহ ইতিহাস যে, শুনলেও সর্ব্বাঙ্গ শীতল হ'য়ে যায়! মুর্ত্তিমান দুঃস্বপ্নেরও অভাব নেই। লণ্ডনের বিখ্যাত পুলিস-কার্য্যালয় 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে'র যাদুঘরের একটা হলে দেখলুম, লম্বা লম্বা অনেকগুলো তাকে সারি সারি সাজানো 'প্লাষ্টারে'র মানুষের মুখের পর মুখ! যে ইন্স্পেক্টার আমাকে সব দেখাচ্ছিলেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এ-সব কাদের মুখ?' তিনি অল্প একটু হেসে বললেন, 'ওদের

গলার দিকে তাকিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন!' তাকিয়ে দেখলুম। প্রত্যেক মুখের গলা বেড়ে একটা ক'রে গোল দাগ—যেন কোন কঠিন বন্ধনী তাদের গলার ভেতরে চেপে ব'সে গেছে! ন্যাড়া-মাথা কঠোর মুখগুলো আমার পানে তাকিয়ে আছে দৃষ্টিহীন স্থির চক্ষে! তার সঙ্গে ঐ গলার দাগ! আমার বুকের মধ্যে জাগল বিভীষিকার শিহরণ!"

—"কেন হেমন্ত?"

—"সেগুলোর প্রত্যেকটা হ'চ্ছে হত্যাকারীর মুখ! ফাঁশী-কাঠে ঝুলে তারা প্রাণত্যাগ করবার পরেই মৃতদেহগুলো নামিয়ে 'প্যারিস-প্লাষ্টার' দিয়ে তাদের মুখের ছাঁচ তুলে নেওয়া হয়েছিল!"

হেমন্তের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বৈঠকখানার বাইরে দ্রুত পায়ের শব্দ হ'ল, তারপরেই বেগে প্রবেশ করলেন ভূপতি-বাবু, তাঁর মুখ-চোখ অত্যন্ত উত্তেজিত!

হেমন্ত একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "একি ভূপতিবাবু, আপনার মুখের চেহারা ভগ্নদূতের মত কেন?"

—"ভয়ানক কাণ্ড! কাল রাত একটার সময়ে ডাক্তার সুনীল চৌধুরীর ওপরে মারাত্মক আক্রমণ হয়েছিল! ভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে গিয়েছেন!"

একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে উদ্দীপিত কণ্ঠে হেমন্ত বললে, "রবীন, রবীন্! তাহ'লে আমার সিদ্ধান্তই ঠিক! কাল গেছে আগষ্ট মাসের এগারোই তারিখ, আমি জানতুম এম্নি একটা কিছু হ'বেই!"

ভূপতি হতভম্বের মত বললেন, "আপনি জানতেন কাল আবার তাসের পাল্লা-খেলা হবে! কি ক'রে জানলেন?"

হেমন্ত তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত স্বরে বললে, "ও-কথা এখন যেতে দিন। তাহ'লে এবারের ডাক্তারবাবু বেঁচে গিয়েছেন?"

—হ্যাঁ। কিন্তু আহত হয়েছেন—যদিও সাংঘাতিক ভাবে নয়।"

—"আর যে তাঁকে আক্রমণ করেছিল?"

—"পালিয়েছে।"

—"কিন্তু কাগজে এ খবরটা বেরোয়নি তো?"

—"তারা এখনো খবর পায়নি।"

—"বেশ, এখন স্থির হয়ে ব'সে সব কথা খুলে বলুন দেখি!" এই ব'লে হেমন্ত আবার ইজি-চেয়ারের উপরে ব'সে পড়ল।

পাঁচ

সিগারেট-কেসের কীর্তি

ভূপতিবাবু বলতে লাগলেন ঃ

"ডাক্তার সুনীল চৌধুরীর বাড়ী তালতলায়। আপনারা সকলেই নিশ্চয় তাঁর নাম শুনেছেন, কারণ তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত অস্ত্র-চিকিৎসক।

কাল রাত স'বারোটার সময়ে একখানা সাদা-রঙের মস্ত মটর-গাড়ীতে চেপে একটি লোক তাঁকে জরুরি কেসের জন্যে ডাকতে আসে। লোকটার একমাত্র ছেলে নাকি তেতালা থেকে প'ড়ে গিয়েছে, এখনি তাকে দেখতে যেতে হবে। তার চেহারার যে বর্ণনা পেয়েছি, তাঁর সবটাই ডাক্তার বিশ্বাসের দরোয়ানের বর্ণনার সঙ্গে অবিকল মিলে যায়। সেই লম্বা ও পাকা চুল, দাড়ী-গোঁফ, সেই ধনুকের মতন দুমড়ে-পড়া কোলকুঁজো দেহ, চোখে ধোঁয়াটে-রঙের চশমা।

সুনীলবাবুর পরমায়ুর জোর খুব। প্রচুর অর্থলোভেও তখনি লোকটার সঙ্গে তার গাড়ীতেই যেতে রাজি হন নি—গেলে ডাক্তার বিশ্বাসের মতন তাঁকেও নিশ্চয় জ্যান্তো অবস্থায় আর গাড়ীর ভিতর থেকে বেরুতে হ'ত না।

তাঁর নারাজ হওয়ার কারণ, তখন তিনি অন্য একটা জরুরি 'কেস' দেখতে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। আগন্তুককে

তিনি বললেন, 'আপনার ঠিকানা রেখে যান। এই 'কেস'টা দেখে আমি নিজের গাড়ীতেই আপনার ওখানে যাব।'

অগত্যা আগন্তুক ঠিকানা দিয়ে গেল—পঁইত্রিশ নম্বর সুবোধ মজুমদার লেন।

ডাক্তার চৌধুরী যখন সুবোধ মজুমদার লেনে গিয়ে পৌঁছুলেন রাত তখন প্রায় একটা। কোথাও জনমানবের সাড়া নেই। গলির ভিতরটা পাতালের মতন অন্ধকার—আজ-কালকার নিবু-নিবু গ্যাসপোষ্টও যেটুকু আলো দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে সেখানে তাও ছিল না। আমার বিশ্বাস, এ কাজ হত্যাকারীদেরই।

কিন্তু ডাক্তার চৌধুরীর কাছে ছিল 'টর্চ্চ', তিনি গাড়ী থেকে নেমে সেইটে জ্বেলেই গলির মধ্যে প্রবেশ করলেন।

গলিটা খানিক পরেই মোড় ফিরে গিয়েছে। ডাক্তার চৌধুরী ঊর্দ্ধমুখে 'টর্চ্চে'র আলোতে বাড়ীর নম্বর খুঁজতে খুঁজতে যেই সেই মোড়ের কাছে গিয়েছেন, অমনি কে একজন আচম্কা বাঘের মতন তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে প্রায়-অবরুদ্ধ তীব্র স্বরে বললে—'প্রতিশোধ', তারপরে সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর বুকের উপরে করলে অস্ত্রাঘাত! কিন্তু তিনি সেই প্রথম আঘাতটা সামলে গেলেন আশ্চর্য্য উপায়ে! তাঁর বুক-পকেটে ছিল একটা পুরু রূপোর ভারি সিগারেট-কেস, আততায়ীর ছোরা বা ছুরি তার উপরেই বাধা পেয়ে একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল!

ডাক্তার চৌধুরী সভয় বিস্ময়ে দুই পা পিছিয়ে গেলেন—কিন্তু পর-মুহূর্ত্তে হ'ল দ্বিতীয় আক্রমণ! কিন্তু সেবারের অস্ত্র এসে পড়ল তাঁর বাম হাতের উপরে—সঙ্গে সঙ্গে তিনিও

আর্ত্ত চীৎকার ক'রে উঠে আততায়ীকে করলেন সজোরে এক পদাঘাত।

অন্ধকারে একটা ভারি দেহের পতনশব্দ হ'ল—তারপরেই তিনি শুনলেন, দুই-তিনজন লোক যেন বেগে ছুটে গলির ভিতর-দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। মারামারির সময়ে তাঁর হাতের 'টর্চ্চ্'টা মাটির উপরে ঠিক্‌রে প'ড়ে গিয়েছিল, তাই সেটা জ্বেলে তিনি শত্রুদের কারুকে দেখবার সুযোগও পেলেন না।

এদিকে তাঁর চীৎকার শুনে গলির বাসিন্দারা জেগে নীচে নেমে এল। আলো জ্বেলে তন্ন-তন্ন ক'রে চারিদিক খোঁজা হ'ল, কিন্তু আক্রমণকারীরা তখন একেবারেই অদৃশ্য হয়েছে।

সেই খোঁজাখুঁজির সময়ে দেখা গেল, ঘটনাস্থলে প'ড়ে রয়েছে একখানা তাসের পাঞ্জা, আর তার চারটে ফোঁটা কেটে বার ক'রে নেওয়া!

বলা বাহুল্য, সুবোধ মজুমদার লেনে পঁইত্রিশ নম্বর বাড়ী খুঁজে পাওয়া যায়নি।"

আমি বললুম, "রাখে কৃষ্ণ মারে কে! একটা তুচ্ছ সিগারেট-কেস করলে ডাক্তারবাবুর প্রাণরক্ষা!"

ভূপতিবাবু বললেন, "আর-একটা লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে, এবারে ডাক্তার চৌধুরী প্রাণে মারা পড়েন নি, কিন্তু তবু পাওয়া গিয়েছে তাসের পাঞ্জা!"

হেমন্ত বললে, "ও-জন্যে বিস্মিত হবার দরকার নেই। হত্যাকারী নিশ্চয়ই আগে থাকতে তাসের পাঞ্জার ফোঁটা কেটে প্রস্তুত হয়ে আসে। আর হত্যাকাণ্ডের আগেই সেখানা ঘটনাস্থলে নিক্ষেপ করে।"

ভূপতিবাবু বললেন, "কিন্তু এমন আজ্‌গুবি কাণ্ড তো

কখনো শুনিনি বাবা! করবি তো মানুষ খুন, তার সঙ্গে আবার তাসখেলা কেন? আর এই পাঞ্জার ফোঁটাগুলো কেটে নেওয়ারই বা অর্থ কি?"

হেমন্ত বললে, "হত্যাকারীদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেই এর অর্থ বুঝতে দেরি হবে না।"

—"উদ্দেশ্য? হত্যাকারীদের উদ্দেশ্য আমি ঠিক ধ'রে ফেলেছি।"

—"তাই নাকি?"

—"তা নয়তো কি! হত্যাকারীদের উদ্দেশ্য বুঝে বুঝে মাথার চুল পাকিয়ে ফেললুম যে! তা না পারলে কি আমাদের কাজ চলে মশাই? ব্যাপারটা কি জানেন? এই খুনেবেটাদের পিছনে আছে একদল হাতুড়ে ডাক্তার! পাস-করা ডাক্তারদের জন্যে তাদের অন্ন একেবারে মারা যেতে বসেছে দেখেই তারা এই ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করেছে। একদল গুণ্ডা ভাড়া করেছে পাস-করা ডাক্তারদের একে একে সরাবার জন্যে! উদ্দেশ্য তো বুঝেছি হেমন্তবাবু, তবু এই তাসের পাঞ্জার মানে বুঝতে পারছি না তো!"

আমি দেখলুম, হেমন্তের চোখ ও ঠোঁট ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন দুর্জ্জয় হাসির উচ্ছ্বাস। কিন্তু তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে উচ্ছ্বাসকে দমন ক'রে সে উঠে পড়ল। তারপর পাঞ্জাবীটা পরতে পরতে বললে, "ভূপতিবাবু, দয়া ক'রে আমাকে এখনি একবার ডাক্তার চৌধুরীর কাছে নিয়ে যেতে পারবেন?"

—"তা আর পারব না কেন?"

হেমন্ত আমাকেও সঙ্গী হবার জন্যে ইঙ্গিত করলে।

…সেই প্রথম আঘাতটা সামলে গেলেন আশ্চর্য্য উপায়ে !

—৩৭ পৃষ্ঠা

ছয়

মোহনলালের নিমন্ত্রণ

ডাক্তার সুনীল চৌধুরী একখানা কৌচের উপরে ব'সে ছিলেন। তাঁর বয়স চল্লিশের কম হবে না। বেশ বলিষ্ঠ দেহ। বাম হাতের উপরে ব্যাণ্ডেজ।

তাঁর সামনের দু'খানি আসনে হেমন্ত ও ভূপতিবাবু, সব-পিছনে আমি।

সুনীলবাবুর নিজের মুখে হেমন্ত কল্যকার কাহিনী আর-একবার শ্রবণ করলে। কিন্তু নূতন কোন তথ্য পাওয়া গেল না।

হেমন্ত জিজ্ঞাসা করলে, "মিঃ চৌধুরী, আক্রমণকারী যে ছোরা মারবার আগে 'প্রতিশোধ' কথাটি উচ্চারণ করেছিল, এ-বিষয়ে আপনার কোনই সন্দেহ নেই তো? মনে রাখবেন, কেবল এই প্রশ্ন করবার জন্যেই আমি আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি!"

ডাক্তার চৌধুরী বললেন, "শুনতে আমার কিছুমাত্র ভুল হয়নি। সে লোকটা চাপা অথচ এমন ভয়ানক তীব্রস্বরে 'প্রতিশোধ' কথাটা উচ্চারণ করেছিল যে, তা আমার কাণে এসে ঢুকেছিল অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই। না, আমার শুনতে ভুল হওয়া অসম্ভব—একেবারেই অসম্ভব!"

—"তাই যদি হয়, তাহ'লে বলুন দেখি মিঃ চৌধুরী,

আপনার এমন শত্রু কে থাকতে পারে, যে আপনার প্রাণবধ করতে চায় ?"

ডাক্তার চৌধুরী মিনিট-কয়েক নীরবে চিন্তা ক'রে বললেন, "আমার এমন কোন শত্রু আছে ব'লে আমি বিশ্বাস করি না।"

—"আচ্ছা যে-লোকটি আপনাকে ডাকতে এসেছিল, তাকে দেখে আপনার চিনি-চিনি ব'লে মনে হয়নি ?"

—"না।"

—"আমার বিশ্বাস, সে পরচুল প'রে ছদ্মবেশে আপনার কাছে এসেছিল।"

—"তাহ'লে তাকে চিনব কেমন ক'রে বলুন ? তার চোখ দেখলেও যদি-বা কিছু ধরা যেত, কিন্তু সে উপায়ও ছিল না। ধোঁয়াটে-রঙের চশমার আড়ালে তার চোখদুটো ছিল প্রায়-অদৃশ্য। তবে একটা কথা বলতে পারি। সেই বৃদ্ধের দেহ বেঁকে দুমড়ে পড়েছিল বটে, কিন্তু সোজা হয়ে দাঁড়ালে মাথায় সে বোধ হয় ছ' ফুটের কম উঁচু হবে না!"

ভূপতিবাবু প্রশংসা-ভরা কণ্ঠে বললেন, "ধন্যি, হেমন্তবাবু, ধন্যি! পায়ের দাগ দেখে আপনি তো ঠিকই আঁচ্ করেছিলেন!"

ডাক্তার চৌধুরী বললেন, "সে-লোকটার হাতে ছিল একগাছা মোটা লাঠি!"

ভূপতিবাবু বললেন, "আরে, আরে, হেমন্তবাবুর কথার সঙ্গে এও যে মিলে যাচ্ছে! মিঃ চৌধুরী, আপনি লোকটার আর-কিছু বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছিলেন ?"

—"হ্যাঁ। সে লাঠি নেয় বাঁ হাতে।"

ভূপতিবাবু অতীব বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেলেন।

হেমন্ত বললে, "ভূপতিবাবু, মিঃ চৌধুরী যে তাসের পাঞ্জাখানা কুড়িয়ে পেয়েছেন, সেখানা আপনার কাছে আছে?"

—"না, থানায় আছে। কিন্তু তার মধ্যে তৃতীয় তাসখানার মতন উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই।"

—"তৃতীয় তাসখানায় যে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল, এ-কথা তো আমায় বলেন নি!"

—"ডাক্তার বিশ্বাসের মৃতদেহের পাশ থেকে রাত্রে যখন তাসখানা পাই, তখন তার একটা বিশেষত্ব আমার চোখে পড়েনি। পরের দিন সকাল-বেলায় আপনার সঙ্গে তদন্ত সেরে থানায় ফিরে গিয়ে দেখি, তাসের গায়ে রয়েছে অল্প-একটু রক্ত-মাখা একটা বুড়ো আঙুলের আভাস! এ-কথাটা আপনাকে জানাতে ভুলে গিয়েছি, ক্ষমা করবেন।"

হেমন্ত অভিযোগের স্বরে বললে, "এত-বড় কথাটা ভুলে যাওয়া আপনার উচিত হয়নি। সে তাসখানা থানায় গেলে দেখতে পাব?"

—"না হেমন্তবাবু, তাসখানা সেইদিনই আমি যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছি 'ফোটোমাইক্রোগ্রাফি'র সাহায্যে আঙুলের enlarged ছাপ তোলবার জন্যে। ছবিও উঠেছে, কিন্তু কলকাতার কোন অপরাধীরই আঙুলের সঙ্গে এ ছবির আঙুল মিলল না। তবে বাইরের সব জায়গাতেও ছবি পাঠানো হয়েছে, ফলাফল আজ-কালের মধ্যেই টের পাওয়া যাবে।"

—"যাক্, এতটা যখন করেছেন, তখন আমার আর কোন অভিযোগ নেই।"

ভূপতিবাবু বাহাদুরি দেখাবার সুবিধা পেলে ছাড়বার ছেলে নন। গর্ব্বিত স্বরে বললেন, "আবার বলি হেমন্তবাবু, আমরা হচ্ছি গিয়ে পেশাদার পুলিসের লোক! কাঁচা কাজ আমার কাছ পাবেন না!"

ঠিক সেই সময়ে ঘরের ভিতরে যে-যুবকটি প্রবেশ করলে, তাকে আমি আর হেমন্ত দুজনেই খুব চিনি। সে হচ্ছে মোহনলাল, দশম শ্রেণী থেকে প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত সে আমাদের ইস্কুলের সহপাঠী ছিল। তারপর আমরা ভর্ত্তি হই প্রেসিডেন্সি কলেজে, আর সে যায় বিদ্যাসাগর কলেজে। আজ নয়-দশ বৎসর পরে তার সঙ্গে আমাদের এই প্রথম সাক্ষাৎ।

মোহনলাল আমাদের দেখেই চিনতে পারলে। বিস্মিত-আনন্দে ছুটে এসে বললে, "একি, রবীন! হেমন্ত! এত কাল পরে দেখা! তোমরা এখানে যে?" তারপরেই ধরাচূড়োপরা ভূপতিবাবুকে দেখেই সে বললে, "ও, শুনেছি বটে, হেমন্ত আজকাল মস্ত-বড় ডিটেকটিভ হয়েছে!"

হেমন্ত হাসতে হাসতে বললে, "আমিও শুনেছি, তুমিও বড় কম মস্ত-বড় অ্যাটর্ণি হওনি!"

হেমন্তের একখানা হাত চেপে ধ'রে মোহনলাল বললে, "বেশ ভাই, বেশ! স্বীকার করা গেল, আমরা দুজনেই মস্ত-বড় হয়েছি! তারপর, কেমন আছ বল দেখি? রবীন, তুমিও ভালো তো?"

দুজনেই মানলুম, আমরা কেহই মন্দ নেই।

হেমন্ত বললে, "কিন্তু তোমাকে এখানে দেখতে পাব ব'লে তো আশা করিনি! ব্যাপার কি? কারুর অসুখ-বিসুখ হয়েছে নাকি?"

মোহনলাল বললে, "না, আমি এসেছি মিঃ চৌধুরীর খবর নিতে। কাল ওঁর মাথার ওপর দিয়ে যে বিপদের ঝড় ব'য়ে গেছে, তাই শুনেই আমি ছুটে এসেছি। আমার স্বর্গীয়া স্ত্রী ওঁরই চিকিৎসাধীন ছিলেন কিনা!" স্ত্রীর কথা উচ্চারণ করার সঙ্গে-সঙ্গেই তার মুখখানি বিমর্ষ হয়ে এল।

আমি বললুম,"মোহনলাল, তোমার স্ত্রী মারা গিয়েছেন শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলুম। শুনেছিলুম, তুমি ঈশানপুরের বিখ্যাত দানশীল জমিদার পরমানন্দ রায়-চৌধুরীর একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করেছিলে।"

—"একমাত্র কন্যা নয় রবীন, একমাত্র সন্তান! তাকে হারিয়ে আমার শ্বশুর-মশাইয়ের যে-অবস্থা হয়েছে, দেখলে দুঃখে প্রাণ গ'লে যায়। আজ তিন মাস হ'ল আমার স্ত্রী স্বর্গে গিয়েছেন। মিঃ চৌধুরী তাঁকে ঠিক নিজের মেয়ের মতন যত্ন নিয়ে চিকিৎসা করেছেন, ওঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ কখনো শোধ হবে না।"

ডাক্তার চৌধুরী দুঃখিত ভাবে বললেন, "কিন্তু আমার সমস্ত যত্ন-চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তাঁকে আমি বাঁচাতে পারিনি।"

মোহনলাল বললে, "তার জন্যে আপনি দায়ী নন। ভগবানের মার, কে বাধা দিতে পারে? সকলি আমার অদৃষ্ট!"

ভূপতিবাবু গাত্রোত্থান ক'রে বললেন, "আপনারা আলাপ করুন, আমি বিদায় হই। আমার অনেক কাজ বাকি—নমস্কার।"

ডাক্তার চৌধুরীর কাছে গিয়ে মোহনলাল বললে, "আপনি এখন কেমন আছেন? বড় বেশী আঘাত লেগেছে কি?"

ম্লান হাসি হেসে ডাক্তার চৌধুরী বললেন, "আঘাত সামান্য

নয় বটে, তবে প্রাণে মারা পড়ি নি ব'লে ভগবানকে আমি ধন্যবাদ দি।"

মোহনলাল বললে, "কে এই পাষণ্ড, যে আপনার মতন লোককেও হত্যা করতে চায়?"

—"আপনার বন্ধু মিঃ হেমন্ত চৌধুরীও সেই কথা জানবার জন্যে চেষ্টা করছেন।"

—"আমার শ্বশুরমশাইও আপনার কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছেন।"

—"তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "মোহনলাল, তোমার সন্তানাদি কি?"

—"একটি ছেলে, একটি মেয়ে। তারাই এখন তাদের দাদামশাইয়ের ধ্যান-জ্ঞান-প্রাণ। আমিও তাদের চোখের আড়াল করতে পারি না ব'লে শ্বশুরমশাই কলকাতায় বালিগঞ্জে এসে বাসা নিয়েছেন। রোজ সন্ধ্যেবেলায় আমার বাড়ীতে এসে নাতি-নাৎনীকে খানিকক্ষণের জন্যে কোলে ক'রে খেলা না করলে তাঁর প্রাণ যেন বাঁচে না।"

এইরকম আরো দু-চার কথার পর আমরাও উঠে বিদায় গ্রহণ করলুম।

রাস্তায় নেমে গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময়ে দেখি মোহনলালও ডাক্তার চৌধুরীর বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

সে হন্-হন্ ক'রে এগিয়ে আমাদের সামনে এসে বললে, "হেমন্ত, রবীন! কাল সন্ধ্যার সময়ে আমার বাড়ীতে তোমাদের দুজনের 'ডিনারে'র নিমন্ত্রণ রইল!"

হেমন্ত একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "হঠাৎ এই নিমন্ত্রণ কেন?"

—"নিমন্ত্রণটাই বড় নয়। তোমার সঙ্গে আমার গোপনীয় পরামর্শ আছে।"

—"গোপনীয় পরামর্শ?"

—"হ্যাঁ, বিশেষ গোপনীয় পরামর্শ। কলকাতায় এই যে ডাক্তারের পর ডাক্তার হত্যা হ'চ্ছে, এ-সম্বন্ধে তোমাকে আমি গোটা-কয়েক দরকারী কথা বলতে চাই। শুনেছি এ-সব মামলার ভার নিয়েছ নাকি তুমিই?"

—"হ্যাঁ।"

—"তাহ'লে নিশ্চয়ই যেও।"

—"যাব। তোমার ঠিকানা?"

—"দশ নম্বর শরৎ পাল রোড।"

সাত

হত্যাকারীর নাম-ঠিকানা

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় নিমন্ত্রণরক্ষা করবার জন্যে গাড়ীর ভিতরে উঠে ব'সে হেমন্ত বললে, "মোহনলালের সঙ্গে দেখা হয় নি প্রায় এক যুগ! তার বিবাহেও সে আমাদের নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত করে নি। আমরাও যদি বিবাহ করতুম, মোহনলালের কথা মনে পড়ত কিনা সন্দেহ! তবু সে এ-খবর রাখলে কেমন ক'রে?"

—"কি খবর?"

—"আমি ডিটেক্‌টিভ্?"

—"হেমন্ত, তুমি যে এখন একজন নামজাদা লোক!"

—"জনসাধারণের কাছে নয়। আমি কাজ করি সকলের চোখের আড়ালে, সখের খাতিরে—খবরের কাগজে আমার নাম পর্য্যন্ত বেরোয় না।"

—"কিন্তু পুলিস আর অপরাধীরা তোমাকে মিত্র আর শত্রু ব'লে চিনে ফেলেছে। তাদের কাছে এখন তুমি অত্যন্ত বিখ্যাত।"

—"কিন্তু মোহনলাল পুলিসের লোকও নয়, অপরাধীও নয়।"

একটু থেমে হেমন্ত আবার বললে, "তারপর দেখ। ডাক্তার চৌধুরীর বাড়ীতে যেতে যেতে ভূপতিবাবু কি বললেন, শুনেছ

তো? খবরের কাগজের রিপোর্টারদের কবল থেকে নিস্তার পাবার জন্যে ডাক্তার চৌধুরী কাল্‌কের ব্যাপারটা একেবারে চেপে গিয়েছেন। এমন-কি যে-গলিতে দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেখানকার বাসিন্দারা তাঁর নাম পর্য্যন্ত জানে না। তবু এত সকালে দুর্ঘটনার কথা মোহনলাল কোন্ সূত্রে জানতে পারলে?.........বড়ই আশ্চর্য্য কথা রবীন, বড়ই আশ্চর্য্য কথা!"

এতক্ষণ পরে হেমন্তের এই বিস্ময় স্পর্শ করলে আমার চিত্তকেও। সত্যকথা, এ-সব ব্যাপার তো মোহনলালের জানবার কথা নয়!

হেমন্ত আবার বললে, "দেখ রবীন, এই ভূপতি লোকটাকে আমার ভালো লাগছে না।"

—"আমারও না।"

—"ইন্‌স্পেক্টার সতীশবাবুর সঙ্গে কাজ ক'রে আনন্দ পাই, কিন্তু ভূপতির সঙ্গে কাজ করা কঠিন। এই দেখ না, তৃতীয় তাসের উপরে রক্তাক্ত আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে, এ কথা সে আমাকে একবারও বলে নি।"

—"বললে তো, ভুলে গেছে।"

—"শোনো কেন! এত-বড় কথা পুলিসের লোক ভোলে না।"

—"তবে?"

—"ইচ্ছে ক'রে চেপে গেছে। ভেবেছিল এই এক প্রমাণেই করবে কেল্লা ফতে! সবাইকে দেখাবে, আমি পারলুম না, কিন্তু সে নিজে করলে খুনীকে গ্রেপ্তার!"

—"তবে সে তোমার সাহায্য নিতে এসেছে কেন?"

—"বাধ্য হয়ে। নিশ্চয়ই সতীশবাবুর কথায়। সতীশবাবু একে তাঁর চেয়ে 'সিনিয়ার', তার উপরে এবারের গেজেটে দেখলুম, তিনি আসছে মাস থেকে হবেন 'অ্যাসিষ্টেন্ট কমিশনার'। কাজেই তাঁর অনুরোধ রক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।......কিন্তু তুমি দেখে নিও রবীন, আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, ভূপতির এত লুকোচুরি ব্যর্থ হবে। ভারতবর্ষের কোথাও এই তাসের আঙুলের ছাপের জোড়া পাওয়া যাবে না—অর্থাৎ ভূপতি প্রমাণ করতে পারবে না যে, কোন জানাশোনা দাগী অপরাধী এই-সব ডাক্তারকে খুন করেছে।"

—"তোমার এমন দৃঢ়-বিশ্বাসের কারণ কি? তুমি কি কোন মীমাংসায় এসে উপস্থিত হয়েছ?"

—"তা হয়েছি বৈকি! নানা প্রমাণের মাঝখানে আমি যে সূত্র গেঁথে চলেছি, তা যে কম-জোরি নয় এটা বুঝতে আমার ব্যাকি নেই। গতকল্য এগারোই তারিখে কোন দুর্ঘটনা ঘটে-নি ব'লে আজ সকালেই নিরাশায় আমার মন ভ'রে গিয়েছিল, এ-কথা তুমি জানো। ভেবেছিলুম আমার সব ধারণাই বুঝি ব্যর্থ হয়ে গেল! তারপরেই ভূপতির মুখে যখন কালকের দুর্ঘটনার কথা শুনলুম তখন আমার গভীর নিরাশার মধ্যে জ্বলল ফের আশার বাতি।"

আমি সাগ্রহে বললুম, "বল কি হেমন্ত! তা'হলে তুমি কি সত্যের সন্ধান পেয়েছ?"

—"পেয়েছি।"

—"কে এই অপরাধী?"

—"তার নাম এখনো জানি না।"

—"তার ঠিকানা জেনেছ তো?"

—"হ্যাঁ।"

—"কোথায়, কোথায় ?"

—"অন্ধকারে।"

—"তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ ?"

—"না, সত্যিকথা বলছি।"

—"তাহ'লে তুমি অপরাধীর নাম বা ঠিকানা কিছুই জানো না ?"

—"উঁহু।"

—"তবে তোমার এতটা আশার কারণ কি ?"

—"মানুষ যে আশাবাদী। আশাই যে তার জীবনের সব চেয়ে বড় সম্বল।"

—"কিন্তু তোমার আশায় যদি ছাই পড়ে ?"

—"ভয় নেই, তখন আমি কাঁদব না!"

—"কিন্তু শত্রু হাসবে।"

—"হাসতে দাও বন্ধু, হাসতে দাও। শত্রুকে যে হাসাতে পারে সার্থক তার জীবন!"

আমি রাগ করে বললুম, "ভূপতিকে আমার ভালো লাগে না, কিন্তু তুমি হ'চ্ছ অসহনীয়!"

হেমন্ত বিপুল কৌতুকে অট্টহাস্য ক'রে উঠল। হাসতে হাসতেই বললে, "ভায়া হে, অসহনীয় হওয়া শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ! তপ্ত সূর্য্যও অসহনীয়, কিন্তু মানুষ তবু তাকে ভালোবাসে। এও জানি বন্ধু, যতই অসহনীয় হই, তুমিও আমাকে ভালোবাসতে ছাড়বে না। যাক্ ও-সব কথা, এই আমরা শরৎ পাল রোডে এসে পড়েছি। এখন খুঁজে দেখতে হবে আমাদের 'ডিনার' অপেক্ষা করছে কোন্ বাড়ীতে!"

আট

তাসের পাঞ্জায় গুপ্তকথা

মোহনলালের বাড়ীতে গিয়ে মোহনলালের দেখা পেলুম না। আমাদের অভ্যর্থনা করলেন একটি গৌরবর্ণ দীর্ঘদেহ ভদ্রলোক—পরোণে তাঁর খদ্দরের মোটা চাদর জামা কাপড়। দাড়ী-গোঁফ কামানো।

বললেন, "এস বাবা, এস। তোমাদের পরিচয় আমি শুনেছি। মোহনলাল আমার জামাই, সুতরাং তোমরাও আমার ছেলের মত।"

সবিস্ময়ে তাঁর মুখের পানে তাকালুম। ইনিই ঈশানপুরের ধনকুবের জমিদার পরমানন্দ রায়-চৌধুরী। বাংলাদেশের কত হাসপাতাল, কত বিদ্যালয়, কত অনাথ-আশ্রম এবং কত দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ও বন্যাগ্রস্ত জেলা যে এঁর অবারিত ধনভাণ্ডার থেকে কত লক্ষ টাকা সাহায্যলাভ করেছে, তার হিসাব কেউ জানে না।

পরম শ্রদ্ধাভরে আমরা দুজনেই নত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম।

আমাদের আশীর্ব্বাদ ক'রে তিনি বললেন, "বৈঠকখানায় বসবে এস। মক্কেলের এক জরুরি কাজে মোহনলালকে হঠাৎ বেরুতে হয়েছে—সে এসে পড়ল ব'লে। যদিও বুড়ো হয়েছি,

তবু মোহনলাল যতক্ষণ না আসে আমিই তোমাদের ভার গ্রহণ করতে পারব। এস।"

তিনি নিজেকে বুড়ো ব'লে পরিচিত করলেন বটে, কিন্তু তাঁকে দেখাচ্ছিল চল্লিশ বছরের সবল ব্যক্তির মত। অবশ্য তারপর শুনেছিলুম, তিনি নাকি পঞ্চাশ পার হয়েছেন!

বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকলুম। একেবারে আধুনিক কায়দায় সাজানো-গুছানো ঘরটি। যেমন আলোর বাহার, তেমনি ছবির বাহার, তেমনি সোফা-কৌচ-কার্পেটের বাহার।

আমাদের সোফা-কৌচের উপরে আসন গ্রহণ করতে ব'লে পরমানন্দবাবু নিজে ব'সে পড়লেন কার্পেটের উপরে, আসন-পিঁড়ি হয়ে।

হেমন্ত কৌচের উপরে বসতে গিয়েই দাঁড়িয়ে উঠে ব্যস্ত ভাবে বললে, "ওকি, ওকি, আপনি বসবেন ওখানে!"

পরমানন্দবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে ধীরে ধীরে বললেন, "আর বাবা, আপনার বলতে সবাই যখন ছিল, তখন আমিও ছিলুম বিলাসী ফুলবাবু। এখন সবাই আমাকে ছেড়ে গিয়েছে, তাই আমিও ছেড়ে দিয়েছি সমস্ত সখের বাহুল্য। আজ আমার শ্রেষ্ঠ আসন হচ্ছে ধরণী-আসন, শ্রেষ্ঠ আহার হচ্ছে হবিষ্যান্ন, শ্রেষ্ঠ চিন্তা হচ্ছে পরকালের চিন্তা!"

আমি বললুম, "তবে আমরাও কার্পেটের ওপরে বসব।"

আমরা দুজনেই তাঁর সামনে কার্পেটের উপরেই আসন গ্রহণ করলুম।

তিনি আপত্তি করলেন না। বললেন, "একালের ছেলেরা এখনো বয়োবৃদ্ধদের সম্মান ভোলেনি দেখে সুখী হলুম।"

তারপর তাঁর সঙ্গে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হ'ল

খানিকক্ষণ। যদিও তিনি গম্ভীর নন, তবু এক ঘণ্টার মধ্যে তাঁর মুখে একবারও দেখলুম না এতটুকু হাসির আভাস। পরমানন্দবাবু যেন মূর্ত্তিমান বিষাদ! কথায় কথায় তিনি তাঁর স্বর্গীয় কন্যার প্রসঙ্গ তুললেন কয়েকবার।

বললেন, "সংসারে আমার শেষ-বন্ধন ছিল ঐ মেয়েটি। তাকেও আমি হারালুম—আমার মতন অভাগা আর কেউ নেই। দুটি শিশু নাতি-নাতিনী আছে বটে, কিন্তু তাদের ভরসা আর রাখি না! ঐ শিবরাত্রির সল্‌তে দুটি জ্বলতে জ্বলতেই যেন চোখ বুঁজতে পারি—এখন এই আমার একমাত্র কামনা!"

এমন সময়ে মোহনলাল এসে হাজির। তাকে দেখেই পরমানন্দবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "এই তোমাদের বন্ধু এল, আমার পালাও ফুরুলো! নাও, এখন ওপরে উঠে বোসো! তোমাদের পাশে কি আমাকে মানায় বাবা? এ যে শুক্লপক্ষ আর কৃষ্ণপক্ষ!" তিনি তালতলার চটি প'রে সশব্দে চ'লে গেলেন।

মোহনলাল কাঁচুমাচু মুখে বললে, "ভাই আমি ছিলুম না ব'লে তোমরা—"

হেমন্ত বাধা দিয়ে বললে, "থাক্, তুমি যা বলতে চাও, বুঝেছি। আগে কিছু চায়ের ফরমাজ কর দেখি!"

ভৃত্যকে চা আনতে হুকুম দিয়ে মোহনলাল বললে, "আমার শ্বশুর-মশাইয়ের সঙ্গে আলাপ হ'ল?"

আমি হেসে বললুম, "আমরা তো আলাপ করতেই চেয়েছিলুম, কিন্তু ওঁর মন তো দেখলুম বিলাপে ভরা।"

—"হ্যাঁ, উনি নিজেও সেটা বোঝেন, তাই সমাজে মেলা-মেশা ছেড়ে দিয়েছেন।"

হেমন্ত বললে, "কিন্তু চমৎকার চিত্তাকর্ষক লোক! ওঁর অবর্ত্তমানে ঈশানপুরের জমিদারীর মালিক হবে কে?"

—"জমিদারীর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হবে আমার ছেলে, কিন্তু নগদ টাকাকড়ির সমস্তই উনি সাধারণ সৎকার্য্যে দান ক'রে যেতে চান। এরি-মধ্যে উইলও নাকি হয়ে গেছে।"

আমি বললুম, "এমন সাধুপুরুষ একালে দেখা যায় না।"

চা এল। একটা পেয়ালা তুলে নিয়ে হেমন্ত বললে, "এই-বার কাজের কথা হোক্। আমার সঙ্গে তোমার কি পরামর্শ আছে?"

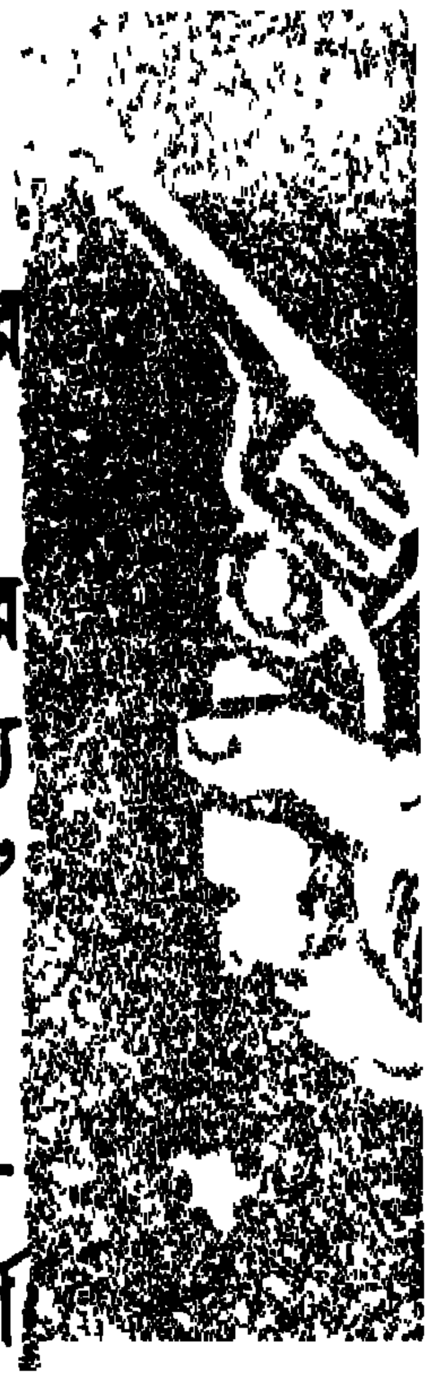

মোহনলালের মুখের উপরে একটা কালো ছায়া নেমে এল। একটু চুপ ক'রে থেকে সে বললে, "ঠিক পরামর্শ নয় ভাই! একটা কারণে আমি বড় বিস্মিত হয়েছি।"

—"কারণটা শুনি?"

—"তাহ'লে একটু গোড়া থেকেই বলতে হয়। কাল তোমাকে বলেছি, আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে আজ তিনমাস। তার আগে প্রায় দেড় বৎসর ধ'রে তিনি রোগ ভোগ করেছেন, আর গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত ছিলেন ডাক্তার সুনীল চৌধুরীর চিকিৎসাধীনে।"

—"অসুখটা কি?"

—"অ্যালোপাথ্রা বলেছেন ক্যান্সার, কবিরাজরা বলেছেন অন্য রোগ। রোগ কিছুতেই কম্‌ছে না দেখে মিঃ চৌধুরী আর চারজন বড় বড় ডাক্তার এনে একদিন পরামর্শ করলেন। পরামর্শে স্থির হ'ল, অস্ত্র-চিকিৎসার দরকার। আমি আর-বিশেষ ক'রে আমার শ্বশুরমশাই ছিলুম অস্ত্র-চিকিৎসার বিরুদ্ধে। কিন্তু ডাক্তাররা এমন ভয় দেখালেন যে, শেষটা আমাদেরও

বাধ্য হয়ে মত দিতে হ'ল। অস্ত্র-চিকিৎসার তিন দিন পরে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়।"

হেমন্ত বললে, "অত্যন্ত দুঃখের কথা। কিন্তু এ-বিষয় নিয়ে এখন আর আলোচনা ক'রে লাভ তো নেই!"

—"জানি। কিন্তু আমার স্ত্রীর মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে আমি তোমাকে ডাকিনি।"

—"তবে?"

—"কলকাতায় ডাক্তারের পর ডাক্তার হত্যা হচ্ছে, আর তুমিই হ'চ্ছ এই রহস্যময় মামলার প্রধান পরামর্শদাতা।"

—"কে তোমায় বললে?"

—"নামে দরকার নেই। বল, এ-কথা সত্যি কিনা?"

—"হ্যাঁ।"

—"তিনজন ডাক্তার মারা পড়েছেন, চতুর্থ ডাক্তার মিঃ চৌধুরী মারা যেতে যেতে বেঁচে গিয়েছেন।"

—"আক্রান্ত হ'তে বাকি আছেন আর একজন মাত্র।" গম্ভীর স্বরে হেমন্ত বললে।

আমি সবিস্ময়ে হেমন্তের মুখের পানে তাকিয়ে দেখলুম! এ-কথা তো সে আমার কাছেও প্রকাশ করেনি!

চম্‌কে উঠে বিবর্ণ মুখে মোহনলাল বললে, "এ-কথা তুমিও জানো?"

—"জানি।"

বাধো-বাধো গলায় থেমে-থেমে মোহনলাল বললে, "আমার স্ত্রীর জন্যে ডাক্তারদের যে পরামর্শ-সভা ব'সেছিল, তাতে কোন্ কোন্ চিকিৎসক ছিলেন জানো? মোহিনীমোহন দত্ত; এন্. বসু, এম. সি. বিশ্বাস; সুনীল চৌধুরী; আর সন্তোষকুমার

সেন। তুমি দেখছ হেমন্ত, সেদিন যাঁরা আমার বাড়ীতে হাজির ছিলেন, আক্রমণ হয়েছে কেবল তাঁদের উপরেই—বাকি একজন ছাড়া! কিন্তু কে বলতে পারে কবে তাঁরও মাথায় পড়বে খাঁড়া?"

—"হত্যাকারীর দৃষ্টি কবে যে সন্তোষবাবুর উপরে পড়বে সেটা আমার অজানা নেই!" হেমন্ত কথাগুলো বললে বেশ সহজ ও শান্ত ভাবেই।

ভয়বিহ্বল চোখে মোহনলাল বললে, "ভাই, এই আমার গুপ্তকথা। আমি এ-রহস্যের কারণ বুঝতে পারছি না। দিন-রাত খালি এই কথা ভাবছি, অথচ কারুর কাছে কিছু প্রকাশ করতেও সাহস পাচ্ছি না। তুমি এর কোন সদুত্তর দিতে পারো?"

—"সেটা আমার সাধ্যের বাইরে।"

—"অথচ তুমি এত কথা জানো!"

—"অনেক কথাই জানি, কিন্তু আপাতত শেষ-কথা বলবার শক্তি আমার নেই। আমার অবস্থা এখন কি-রকম জানো! 'পরো দীপমালা নগরে নগরে, তুমি যে-তিমিরে তুমি সেই-তিমিরে'!"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তোমার শ্বশুরমশাই এ-কথা জানেন?"

—"জানেন। তিনি আবার আমারও চেয়ে অভিভূত হ'য়ে পড়েছেন। তাঁর মন নরম। কেউ একটা পোকা মারলেও তাঁর সহ্য হয় না। তৃতীয় হত্যাকাণ্ডের পর থেকে ভয়ে তিনি খবরের কাগজ পড়া পর্য্যন্ত ছেড়ে দিয়েছেন।"

হেমন্ত জিজ্ঞাসা করলে, "ডাক্তার সন্তোষকুমার সেনের ঠিকানা কি?"

—"পাঁচ নম্বর মদন ঠাকুর রোড, বালিগঞ্জ।"

ঠিকানাটা পকেট-বুকে টুকে নিয়ে হেমন্ত উঠে দাঁড়িয়ে ললে, "মোহনলাল, আমার ক্ষিদে পেয়েছে!"

—"চল, খাবার তৈরি।"

বৈঠকখানা থেকে বেরিয়েই দেখি, উপরের সিঁড়ি দিয়ে ীচে নেমে এলেন পরমানন্দবাবু।"

মোহনলাল জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি কি বাসায় যাচ্ছেন?"

—"হ্যাঁ বাবা, রাত হ'ল। তোমার বন্ধু দুটিকে ভালো লাগলো। ওঁদের আবার দেখতে পেলে খুসি হব।"

পরমানন্দবাবু চলে গেলেন। আমরাও মোহনলালের পিছনে পিছনে চললুম খাবার-ঘরের দিকে।

•

গাড়ীতে উঠে বাড়ী ফেরবার পথে হেমন্তকে বললুম, "তুমি আগে থাকতেই জানতে, পাঁচজন ডাক্তারের মৃত্যু হবার সম্ভাবনা?"

—"জানতুম বললে ঠিক হবে না, অনুমান করেছিলুম।"

—"অথচ আমার কাছে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করনি!"

—"এ ব্যাপারটা ক-খ পড়ার মতন সহজ, আমি আবার প্রকাশ করব কি?"

—"তোমার কাছে সহজ হ'তে পারে, আমার কাছে নয়।"

—"তুমিও যদি ভূপতির দলের লোক হও, আমি কি করব বল? একদিন তোমাকে আমি ইঙ্গিতও দিয়েছিলুম যে, এই মামলার অপরাধী হ'চ্ছে 'রোমান্টিক' বা উৎকট কল্পনারসিক! এমন-কি এই রহস্যময় তাসের পাঞ্জার দিকেও তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলুম, তবু তুমি বুঝতে চেষ্টা করনি। ঘটনাস্থলে বার বার কেন ঐ তাসের পাঞ্জা পাওয়া যায়? আর কোন

ফোঁটার তাস নয়, কেবল পাঞ্জা! কেন প্রথম খুনের পরে তার একটা ফোঁটা, দ্বিতীয় খুনের পর দু'টো, তৃতীয় খুনের পর তিনটে ফোঁটা কেটে বার ক'রে নেওয়া হয়? এর কারণ কি এই নয় যে, হত্যাকারী বার বার পাঞ্জা বা পাঁচ-ফোঁটার তাস ফেলে গিয়ে এইটেই জানাতে চায় যে, পাঁচজন লোককে হত্যা করাই হচ্ছে তার উদ্দেশ্য? আর এক-একজনকে খুন করার সঙ্গে-সঙ্গে এক-একটা ফোঁটা লুপ্ত ক'রে বোঝবার পক্ষে ব্যাপারটা যথেষ্ট সহজ ক'রে দিয়ে গেছে?"

আমার চোখ ফুটল। লজ্জিত স্বরে বললুম, "ভাই, আমার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যে আমাকে ক্ষমা কর। আমি ভেবেছিলুম ও তাসের পাঞ্জা হচ্ছে কোন গুপ্ত দলের সাঙ্কেতিক চিহ্ন!"

—"হ্যাঁ, ও-কথা তুমি মনে করতে পারতে, যদি প্রত্যেক বারেই পাওয়া যেত অক্ষত তাসের পাঞ্জা। কিন্তু প্রত্যেক খুনের পরে কাটা ফোঁটার সংখ্যা বাড়ছে দেখেও কেমন ক'রে তুমি অমন ভুল ধারণা করেছিলে?"

—"আর আমাকে লজ্জা দিও না ভাই, আমি ঘাট মানছি।"

—"না রবীন, এ ঘাট মানার কথা নয়। ভগবান আমাদের দুজনকেই চোখ-কাণ দিয়েছেন, মানুষের উপযোগী মস্তিষ্ক দিতেও কৃপণতা করেননি। আমরা দুজনে একই সময়ে একই ঘটনাক্ষেত্রে একসঙ্গে চলছি-ফিরছি, সব দেখছি-শুনছি, পরীক্ষা আর আলোচনা করছি। তোমার আড়ালে কিছুই হচ্ছে না, তবু তুমি যদি সত্য উপলব্ধি করতে না পারো, তাহ'লে সেটা হবে দুঃখের কথা। খালি তুমি নও, পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই এই দলে, তারা কাণ থাকতেও কালা, চোখ থাকতেও অন্ধ, বুদ্ধি থাকতেও নির্ব্বোধ। আমাদের সকলের ভিতরেই আছে

অব্যবহৃত শক্তি—সেই শক্তিকে ব্যবহার করতে শেখো, এই আমার অনুরোধ।”

আমি জবাব দেবার ভাষা খুঁজে পেলুম না।

একটু চুপ ক'রে থেকে হেমন্ত বললে, “আজ একটা মস্ত দরকারি ব্যাপার লক্ষ্য করেছ ?”

—“কখন্ ?”

—“যখন আমরা মোহনলালের বৈঠকখানা থেকে খাবার-ঘরে যাবার জন্যে বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়াই, তখন তুমি ছিলে ঠিক মোহনলালের পাশে আর আমি ছিলুম পিছনে—সুতরাং দেখবার সুবিধা ছিল তোমারই বেশী। মোহনলাল যখন তার শ্বশুরের সঙ্গে কথা কইছিল, তখন তুমি কিছু লক্ষ্য করনি ?”

—“না।”

—“রবীন, তোমার ওপরে রাগ করব কি, তুমি হচ্ছ করুণার পাত্র ! এত-বড় স্পষ্ট আর রোমাঞ্চকর ব্যাপারটাও তোমার চোখ এড়িয়ে গেল ? ধিক্ !”

আমি অপরাধীর মত বললুম, “তোমার কথা যে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না ভাই ! কী আমার চোখ এড়িয়ে গেছে ? তুমি কি মোহনলালকেই সন্দেহ কর ?”

হেমন্ত ধমক দিয়ে বললে, “থামো, থামো ! আর কোন কথা তোমার জিজ্ঞাসা করবার অধিকার নেই ! যাও, মায়ের কোলে শুয়ে ঝিনুকে ক'রে দুধ খাওগে যাও—আমার সঙ্গে বেড়িও না !”

নয়

ক্লোরিণ্

মোহনলালের বাড়ীতে এমন কী রোমাঞ্চকর দৃশ্য আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, গেল-দুদিন ধ'রে সেই কথাই ভাবছি আর ভাবছি ক্রমাগত।

কিন্তু কিছুতেই কিছু আন্দাজ করতে পারলুম না।

মোহনলালকে এই ভয়াবহ কাণ্ডে সন্দেহ করবার কোন কারণ আছে নাকি? তার বাড়ীর পরামর্শ-সভায় যে-পাঁচজন ডাক্তার ছিলেন এবং যাঁরা একবাক্যে মত দিয়েছিলেন তার স্ত্রীর দেহে অস্ত্রপ্রয়োগ করবার জন্যে, আক্রমণ হয়েছে কেবল তাঁদেরই চারজনের উপরে। এটা কিছু সন্দেহের কথা বটে! তবে অস্ত্রোপচারের পর তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে ব'লে মোহনলাল বড়-জোর ডাক্তারদের উপরে বিরক্ত হ'তে পারে। কিন্তু বিরক্তি এক কথা, আর নরহত্যা অন্য কথা। মোহনলালের মতন শিক্ষিত যুবক, এই অদ্ভুত কারণে যে নরহত্যা করতে পারবে, এ-কথা স্বপ্নেরও অগোচর।

আর হত্যাকারী হ'লে মোহনলাল কখনো হেমন্তের কাছে সেদিন অত-বড় গুপ্তকথাটা জাহির ক'রে ফেলত না। সে যখন জানে যে, হেমন্তই এই-সব খুনের মামলার তদারক করছে, তখন সে কি তাকে যেচে ডেকে এনে আত্মপ্রকাশ ক'রে

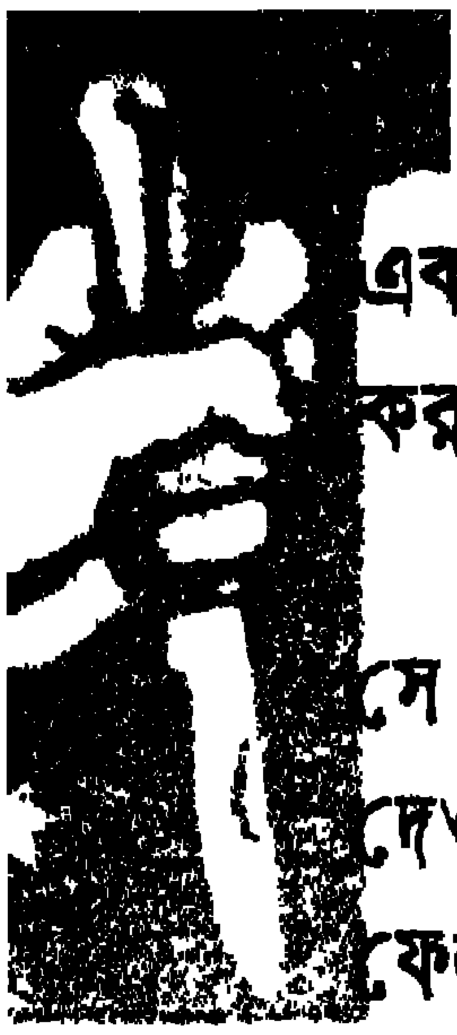

একটা ভীষণ সন্দেহের বোঝা নিজের মাথার উপরে গ্রহণ করতে পারত ?

আচ্ছা, অতখানি সরলতা তার ছলনা নয় তো ? হয়তো সে বুঝেছে হেমন্তের মতন পাকা ডিটেক্‌টিভের চোখে ধূলো দেওয়া সম্ভব নয়, যে-সত্য সে পরে নিজেই আবিষ্কার ক'রে ফেলবে, সে-সম্বন্ধে আগে থাক্‌তে নির্দ্দোষের মতন সাফাই গাইলে অনেকটা নিরাপদ হবার সম্ভাবনা আছে ; আর এটাও হয়তো ভেবেছিল যে, তার সরলতায় ভুলে হেমন্ত কথায় কথায় ফাঁশ্‌ ক'রে ফেলবে—সে কতখানি জানে ও কতখানি জানে না !

ডাক্তার চৌধুরী বলেন, হত্যাকারী তাঁকে আক্রমণ করবার আগে 'প্রতিশোধ' ব'লে চাপা গর্জ্জন ক'রে উঠেছিল। এ-কথাও তো সন্দেহকে চালিত করে মোহনলালের দিকেই !

কয়েকবার ভেবেছিলুম, হেমন্তের কাছে এই প্রসঙ্গটা তুলি। কিন্তু পারিনি, আবার ধমক খেয়ে বোকা বনবার ভয়ে !

আজ সুগম্ভীর মুখে আধিক্যতার ভাব নিয়ে ভূপতিবাবু এসে হাজির। তাঁর মুখ-চোখ ও চলন-ভঙ্গি বলছে যেন—আমার দিকে চেয়ে দেখ, হাম্‌ মার্‌ দিয়া কেল্লা !

ইজিচেয়ার-শায়ী হেমন্ত অর্দ্ধমুদিত নেত্রে তাঁর দিকে চেয়ে ঈষৎ হাস্য ক'রে বললে, "হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি, আপনি আজ জবর খবরের রাজা ! কিন্তু কোন্‌ দিক জয় করলেন ?"

—"আগে চাই চা—কারণ গলা শুকিয়ে গেছে ! সঙ্গে চাই টা—কারণ উদর-গহ্বরে নাড়ী-ভুঁড়ি ছাড়া আর যাবতীয় কিছু হজম হয়ে গেছে ! চপ-কাট্‌লেট্‌ কারি-কোর্ম্মা এমন কি ফাউল-রোষ্ট্‌ পেলেও আপত্তি করব না !"

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললুম, "বলেন কি মশাই? এই বৈকালে চায়ের সঙ্গে কারি-কোর্ম্মা-রোষ্ট! এ যে ভদ্র-সমাজে অবৈধ রীতি—একেবারে অচল!"

—"আমি বাবা গেরস্তের ছেলে, এ খাব না, ও খাব না বলি না! সম্মুখ-দেশে যে-কোন খাদ্য আবির্ভূত হবে, আমার উদর বলবে—স্বাগত! ভাই হেমন্তবাবু, আজ কি-কি আশা করতে পারি?"

—"আপাতত কাট্‌লেট্ আর টিকিয়া-কাবাব আদেশ করলেই আসতে পারে।"

—"আর পেয়ালা-তিনেক চা?"

—"নিশ্চয়!"

—"বেশ, তাই সই!" ভূপতিবাবু চেয়ারের উপরে যে আসনগ্রহণ করলেন, পাড়ার লোকে সেটা জানতে পারলে।

—"তারপর খবরটা শুনি!"

—"খুনীর আঙুলের ছাপের কতকটা কিনারা হয়েছে।"

—"কতকটা মানে?"

—"ওটা কথার কথা আর কি! পাঞ্জাবের একটা পেশোয়ারীর আঙুলের সঙ্গে আমাদের তাসের পাঞ্জার আঙুল মিলে গেছে।"

—"মিলে গেছে?" সবিস্ময়ে এই কথা ব'লে হেমন্ত খাড়া হয়ে উঠে বসল।

—"ঐ, প্রায় মিলে গেছে আর কি!"

—"ওঃ, প্রায়?" হেমন্ত আবার ইজিচেয়ারের উপরে এলিয়ে পড়ল।

—"অবিশ্যি দু-তিন জায়গায় মেলে নি।"

—"সে আমি বুঝেছি।"

—"না মেলবার কারণও আছে।"

—"আছে নাকি ?"

—"হ্যাঁ। যে-সময়ে পেশোয়ারীটার আঙুলের ছাপ নেওয়া হয়, তখন তার আঙুলটা আহত ছিল।"

হেমন্তের মুখে আবার উত্তেজনার চিহ্ন দেখা দিলে—কিন্তু সে মুখে কিছু বললে না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "সেই পেশোয়ারীটা এখন কোথায় ?"

—"তিন মাস আগে সে ছিল লক্ষ্ণৌয়ে। সেখান থেকে সে যে বর্দ্ধমানে আসে, তাও জানা গিয়েছে। কিন্তু তারপর তার আর পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। আমি বলি, যে বর্দ্ধমানে এসেছে সে কলকাতাতেও আসতে পারে—কি বলেন, তাই নয় কি ? কলকাতা-পুলিসের টনক নড়িয়ে দিয়েছি—চারিদিকে চলছে খোঁজাখুঁজি ! বেটা ধরা পড়ল ব'লে।"

হেমন্ত বললে, "কিন্তু এই পেশোয়ারী ভদ্রলোক বেছে-বেছে বাঙালী-ডাক্তার হত্যা করবে কেন ?"

—"তার কারণ তো আগেই দেখিয়েছি। একদল হাতুড়ে ডাক্তার পথ থেকে কাঁটা সরাবার জন্যে গুণ্ডা নিযুক্ত করেছে।"

—"গুণ্ডারা ঘটনাস্থলে তাদের পাঞ্জা ফেলে যাবে কেন ?"

—"ওটা তাদের গুপ্ত দলের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। অনেক মাথা খাটিয়ে ভেবে-চিন্তে আমি এই সত্য আবিষ্কার করেছি।"

—"আপনি আর রবীন দেখছি একই মতাবলম্বী।"

আমার দিকে চেয়ে, দুই ভুরু নাচাতে নাচাতে ভূপতিবাবু বললে, "তাই নাকি ভায়া, তাই নাকি ? এই জন্যেই ইংরেজী

প্রবাদে বলে—মহাজনরা একইরকম ভাবনা ভাবেন।" ব'লেই ঘরের ছাদ ও দেওয়াল ফাটিয়ে এমন হা হা রবে চেঁচিয়ে উঠলেন যে, দুটো টিকটিকি প্রাণপণে দৌড় মেরে অদৃশ্য হ'ল কোথায়!

হেমন্ত আমাকে ভূপতিবাবুর দলে ফেলে দিলে ব'লে রাগে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলতে লাগল।

ভূপতিবাবু হাঁকলেন, "ওরে বাবা মধু, খানা কৈ রে, খানা কৈ ?"

মধু খাবার হাতে ক'রে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে।

হেমন্ত বললে, "ভূপতিবাবু, বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী-ডিটেকটিভরা আঙুলের ছাপকে খুব বেশী আমল দেয় না।"

—"দেয় না নাকি ? একখানা আস্ত কাটলেট অনায়াসে বদন-বিবরে নিক্ষেপ ক'রে ভূপতিবাবু জড়িত স্বরে বললেন, "তারা গাধা!"

—"গাধার সঙ্গে তাদের কোন সাদৃশ্য দেখিনি। আঙুলের ছাপকে খুব বেশী আমল না দিলেও তারা অগ্রাহ্য করে না।"

—"তবে ?"

—"অপরাধী গ্রেপ্তার করবার জন্যে তারা আঙুলের চেয়ে সুবিধাজনক উপায় আবিষ্কার করেছে।"

ইতিমধ্যে দুই বিরাট গ্রাসে দুখানা কাটলেট উড়ে গেছে। এইবার টিকিয়া-কাবাবকে আক্রমণ ক'রে ভূপতিবাবু প্রায়-অস্পষ্ট স্বরে বললেন, "উপায়টা কি, শুনি ?"

—"কাণ।"

বিপুল বিস্ময়ে বাকি টিকিয়া-কাবাব-খানার কথা ভুলে গিয়ে ভূপতিবাবু বললেন, "কাণ? কিসের কাণ? গাধার কাণ নাকি ?"

—"না, গাধার কাণের উপরে দখল আছে কাদের, সে-কথা এখন ব'লে শান্তিভঙ্গ করতে চাই না। ফরাসী-ডিটেক্‌টিভদের কারবার কেবলমাত্র মানুষের কাণ নিয়ে!"

বাকি টিকিয়া-কাবাব-খানাকে উদর-ভাণ্ডারে প্রেরণ ক'রে ভূপতিবাবু বললেন, "আপনার কথা মশাই, বুঝতে পারছি না।"

—"আমি যখন ফ্রান্সের রাজধানী পারী-সহরে বেড়াতে যাই, তখন ফরাসী-পুলিসের প্রধান কার্য্যালয় দেখতে গিয়েছিলুম। সেখানে কেবল পুলিসের লোকের জন্যে একটি মস্ত যাদুঘর আছে। সেই ঘরে ঢুকে প্রথমেই কি চোখে পড়ল জানেন? এক হাত বড় একখানা মানুষের কাণ! সেই কাণের এক এক অংশ নীল, লাল, হলদে ও সাদা রঙে আঁকা! এক-একটি অংশ এক-একটি অক্ষরে চিহ্নিত। তার এই রকম কুড়িটি বিভিন্ন অংশ আছে।"

চায়ের দ্বিতীয় পেয়ালা দ্বিতীয় চুমুকে খালি ক'রে ভূপতিবাবু বললেন, "বাব্বা! কাণ নিয়ে এত টানাটানির মানে হয় না!"

—"তাদের মতে, খুব মানে হয়! কারণ তারা বহু পরীক্ষার পর বুঝতে পেরেছে যে, সারা জগৎ খুঁজলেও একরকম দেখতে দুখানা কাণ আবিষ্কার করা অসম্ভব। তাই তারা অপরাধী গ্রেপ্তার করে কাণ দেখে।"

—"কাণ টানলেই মাথা আসে ব'লে?"

—"প্রায় সেই রকমই আর কি! সব দেশেই অপরাধীদের ফোটো তুলে রাখা হয়, তার সঙ্গে মিলিয়ে আসামী সনাক্ত করবার জন্যে। কিন্তু ফরাসী-পুলিসের মতে, এ প্রথা বিজ্ঞান-

সম্মত নয়। কারণ পৃথিবীতে অবিকল একই রকম দেখতে একাধিক মানুষের অভাব নেই।”

—“এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না।”

—“আপনার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে তাদের কিছু আসে-যায় না। তবে আমাকে বাধ্য হয়ে বিশ্বাস করতে হ’ল। কারণ যাদুঘরের অধ্যক্ষ আমাকে দুখানি ফোটো দেখিয়ে বললেন, ‘এই ছবি দুখানা দেখে আপনার কি মনে হয়?’ আমি বললুম, ‘এ দেখছি তো একই লোকের দু-রকম ফোটো!’ তিনি বললেন, ‘না এ দুখানা মোটেই একজন লোকেরই ফোটো নয়। দেখছেন, প্রকৃতি কি-রকম অবিবেচক? তিনি দুজন মানুষ পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন—কিন্তু তাদের মুখ দেখতে অবিকল একরকম! এতে আমাদের—অর্থাৎ গোয়েন্দাদের কতটা বিপদে পড়তে হয় বলুন দেখি? ফোটোর সঙ্গে মিলিয়ে লোক গ্রেপ্তার করলুম, কিন্তু আদালতে প্রমাণিত হ’ল সে আমাদের ফোটোর মানুষই নয়! আসামী খালাস পেয়ে করলে আমাদের নামে মানহানির নালিস!...তারপর দেখুন, রাস্তায় চলতে চলতে কারুর উপর সন্দেহ হ’লেই আমরা তাকে ধ’রে বলতে পারি না—মশাই, বার করুন তো হাত, আমরা আপনার আঙুলের ছাপ চাই! কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তার কাণ হয় আমাদের সহায়।... বুঝেছেন ভূপতিবাবু, ফরাসী-গোয়েন্দারা কাণ সম্বন্ধে অত্যন্ত বিশেষজ্ঞ। গোয়েন্দা-পাঠশালায় ভর্ত্তি হ’লেই তাদের কর্ণ-সংক্রান্ত শিক্ষা নিতে হবে। তারপর তারা যখন কোন অপরাধী ধরতে যায় তখন তাদের আসামীর কাণের বিশেষত্ব-গুলো ব’লে দেওয়া হয়। আসামী যে-রকম ছদ্মবেশই ধারণ করুক্ আর তাদের নাক ঠোঁট চোখ যে-রকমই হোক্, ফরাসী-

গোয়েন্দা সে-সব নিয়ে একটুও মাথা ঘামায় না। সে কারুর মুখের দিকেই তাকায় না। বৃহৎ জনতার ভিতরেও কেবল কাণ দেখেই আসামীকে চিনতে পারে!"

ভূপতিবাবু অবিশ্বাসের স্বরে বললেন, "যাঃ! কী যে বলেন!"

—"বিশ্বাস করুন ভূপতিবাবু, এর একটাও আমার বানানো কথা নয়। আমি স্বচক্ষে যা দেখেছি, স্বকর্ণে যা শুনেছি, তাই আপনাকে বললুম।"

ভূপতিবাবু বিশ্বাস করলেন কিনা জানি না, কিন্তু আর কোন প্রতিবাদ করলেন না। একটু পরেই তিনি বিদায় নিলেন।

হেমন্ত অনেকক্ষণ গম্ভীর হয়ে কি ভাবলে। তারপর বললে, "রবীন, ভূপতি ঐ পেশোয়ারীর কথা ব'লে আমার মন খারাপ ক'রে দিয়ে গেল! ওর কথা যদি সত্য হয়, তাহ'লে এতদিন ধ'রে যা গ'ড়ে আসছি তার সমস্তটাই ভেঙে প'ড়ে যাবে তাসের বাড়ীর মত! ভূপতির কাছে আমারও হবে বিষম পরাজয়!"

আমি বললুম, "দিন-রাত তুমি একই ভাবনা নিয়ে বড়-বেশী মাথা ঘামাচ্ছ! চল, মনকে ছুটি দেবার জন্যে আজ একটু বেড়িয়ে আসি।"

—"মন্দ কথা নয়। কিন্তু কোথায় যাই বল দেখি?"

—"অনেক দিন পরে শিশির ভাদুড়ী আবার "আলমগীরে"র ভূমিকায় নামবেন। সেখানে গেলে কেমন হয়?"

—"মন্দ মথা নয়। খুনীর পরচুলার চেয়ে শিশির ভাদুড়ীর পরচুলা ঢের-বেশী নিরাপদ! ভাদুড়ীর জয় হোক!"

…সে রাত্রে থিয়েটার ভাঙল রাত প্রায় একটার সময়ে।

অভিনয় দেখতে দেখতেই শুনতে পেয়েছিলুম ঝম্-ঝম্ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তায় বেরিয়ে দেখি, এক হাঁটু জল। হেমন্তের বাড়ীর খানিক আগেই মোটর হ'ল অচল। হাঁটুর উপরে কাপড় তুলে হেমন্তের বাড়ীর সামনে এসে বললুম, "তুমি তো নিজের আস্তানায় এলে। এখন আমার উপায় ?"

—"কেন, তুমিও আমার শয্যার অংশগ্রহণ করবে চল না!"

অগত্যা তার প্রস্তাবেই সায় দিলুম।

দোতালায় হেমন্তের শয়ন-গৃহ। বাহির থেকে দরজার শিকল খুলে ঘরের ভিতরে ঢুকেই হেমন্ত চীৎকার ক'রে আবার এক লাফ মেরে বাইরে এসে পড়ল।

আমি চমকে উঠে বললুম, "কি, কি ? অমন করলে কেন ?"

দু-হাতে বুক চেপে ছুটে নীচে নামতে নামতে হেমন্ত প্রায়-বদ্ধ-স্বরে বললে, "পালিয়ে এস, পালিয়ে এস !"

হতভম্বের মত তার পিছনে পিছনে ছুটে নীচে নেমে গেলুম। নীচের দালানে ব'সে প'ড়ে হেমন্ত খক্-খক্ ক'রে ভয়ানক কাশতে লাগল।

কিছুই বুঝতে পারলুম না—আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। মনের ভিতরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন জাগতে লাগল···তার শোবার ঘরে কি আছে ? আমরা নীচে পালিয়ে এলুম কার ভয়ে ? হেমন্ত অমন ছট্‌ফট্ করছে কেন ?

খানিকক্ষণ পরে সে একটু সুস্থ হ'ল।

—"ব্যাপার কি হেমন্ত ?"

—"ভগবান রক্ষা করেছেন, আর একটু হ'লেই প্রাণে মারা পড়তে হ'ত।"

—"কী বলছ তুমি ?"

—"ক্লোরিণ !"

—"সে আবার কি !"

—"বিষাক্ত গ্যাস !"

—"তোমার ঘরে ?"

—"হ্যাঁ, আমার ঘরে। আমি ও-গ্যাস চিনি !"

—"কিন্তু তোমার ঘরে গ্যাস আসবে কোত্থেকে ?"

—"সেইটেই হচ্ছে প্রশ্ন।" হেমন্ত নীরবে ভাবতে লাগল। তারপরে গম্ভীর স্বরে বললে, "রবীন, আমরা যাদের খুঁজছি আজ তাদের কেউ এসেছিল আমাদের বাড়ীতে।"

—"সর্ব্বনাশ, বল কি হে !"

—"খুনী বুঝেছে আমাকে দুনিয়া থেকে সরাতে না পারলে সে নিরাপদ হবে না।"

—"কিন্তু সে গ্যাস ব্যবহার করলে কেমন ক'রে ? তোমার ঘরের দরজা তো বাহির থেকে বন্ধ ছিল !"

—"হ্যাঁ। বৃষ্টি পড়ছে ব'লে মধু জানালাগুলোও বন্ধ রেখেছে। কিন্তু পাশের মাঠের বটগাছ বয়ে আমার বাড়ীর দোতালার ছাদে ওঠা কিছুমাত্র কঠিন নয়। লক্ষ্য করলেই দেখবে, আমার ঘরের 'ভেন্টিলেটার'গুলো অতিরিক্ত বড়। ঘরের ভিতরে হয়তো বিষাক্ত গ্যাস পাঠানো হয়েছে ঐ পথেই। খুব-সম্ভব খুনীর আবির্ভাব বেশীক্ষণ আগে হয় নি। সে ভেবেছিল আমি ঘরের ভিতরেই ঘুমিয়ে আছি।...রবীন, ভাগ্যে আমি থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলুম! তোমাদের শিশির ভাদুড়ী আমার প্রাণরক্ষা করেছেন!"

বুকের ভিতরটা কাঁপতে লাগল। খুনী যখন আমাদের চেনে, তখন আমরাও হয়তো তাকে চিনি!...কেবল সাহসী

নয়, তার মৌলিকতা ও চাতুর্য্যও বিস্ময়কর। ক্লোরিণ! আমি তার নাম শুনেছি মাত্র, কিন্তু তার গুণাগুণ কিছু জানি না। হেমন্ত রসায়ন-বিদ্যায় পণ্ডিত, ও-সমস্ত নিয়ে নিয়মিত নাড়াচাড়া করার অভ্যাস তার আছে—তাই সে এত সহজেই আসল ব্যাপারটা ধ'রে ফেলেছে। কিন্তু ধন্য এই অজানা হত্যাকারী! ক্লোরিণের সাহায্যে নরহত্যা করবার চেষ্টা এর আগে আর কোন ভারতীয় খুনী করেছে ব'লে শুনি নি।

হেমন্ত বললে, "গত মহাযুদ্ধে জার্ম্মানরাই প্রথমে এই নীলাভ হল্‌দে রঙের সাংঘাতিক গ্যাস প্রথম ব্যবহার করে। ডাক্তারদের ক্লোরোফর্ম্মেও এই গ্যাসের অংশ আছে। ক্লোরিণ যাকে মারে অত্যন্ত যন্ত্রণা দিয়েই মারে। এই দেখ না, তার সংস্পর্শে আসতে না আসতেই আমার কি দশা হয়েছে! এখনো আমি ভালো ক'রে নিশ্বাস টানতে পারছি না!"

দশ

মহম্মদের আবির্ভাব ও তিরোভাব

দুপুর-বেলায় হন্তদন্তের মতন ঘরের ভিতরে ঢুকেই ভূপতিবাবু বললেন, "বেটা বড়ই ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল মশাই !"

হেমন্ত "ক্রিমিনলজি"র পাতা ওল্টাচ্ছিল, আমি পড়ছিলুম বাইরণের কবিতা ।

বইখানা বন্ধ করে হেমন্ত বললে, "পালিয়ে গেল ? কে ?"

—"মহম্মদ খাঁ ।"

—"ও, আপনার আবিষ্কৃত সেই পেশোয়ারী ?"

খুসি হয়ে একগাল হেসে ভূপতিবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তা বলতে পারেন, সে আমারই আবিষ্কার বটে ! আপনি তো পারলেন না, কাজেই বাধ্য হয়ে আমাকেই আবিষ্কার করতে হ'ল !"

—"তাহ'লে মহম্মদ খাঁ বাহাল-তবিয়তে রাজধানীতেই বিরাজমান ? বেশ বেশ, আপনার সিদ্ধান্ত দেখছি আরো দৃঢ় হ'ল !"

—"তা হ'লই তো ! চেষ্টা করলে কী না হয় ?"

—"চেষ্টা করলে আর্সোলা কি পাখী হ'তে পারে ?"

—"পাখী না হোক, উড়তে পারে তো ?"

...ভগবান রক্ষা ক'রেছেন, আর একটু হ'লেই প্রাণে মারা পড়তে হ'ত।...

—৭৪ পৃ

—"সাধু! আপনার যুক্তি অকাট্য।"

—"ঠাট্টা রাখুন, কাজের কথা শুনুন। লোকের মুখে শুনলুম, মহম্মদ টেরিটি-বাজারে এক কফিখানায় গিয়ে ঢুকেছে। তখনি লোকজন নিয়ে আমিও সেখানে ছুটলুম। কফিখানায় গিয়ে দেখি, সে আমাদের দিকে পিছন ফিরে ব'সে সাঙ্গোপাঙ্গদের সঙ্গে খাবার খাচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি তাকে চেপে ধরতে গেলুম। কেউ তাকে ইসারায় সাবধান ক'রে দিলে কিনা জানিনা, কিন্তু তার কাছে যেতেই সে আচমকা উঠে ফিরে দাঁড়িয়ে আমার পেটে মারলে এক লাথি। আমি তো তখনি পপাতধরণীতলে। সে বেটা দৌড় মেরে পিছনের দরজা দিয়ে কোথায় স'রে পড়ল!"

—"আর আপনি পেটে হাত বুলোতে বুলোতে থানায় ফিরে এলেন?"

—"হাসছেন বটে, কিন্তু বেটার দৈত্যের মতন চেহারা দেখলে ও-হাসি শুকিয়ে যেত! জানেন না তো, তার লাথিতে কি জোর! আপনারা হচ্ছেন গিয়ে ইজি-চেয়ারের বাবু-গোয়েন্দা! আমাদের মতন হাতে-নাতে আসামী ধরতে হ'লে টের পেতেন মজাটা!"

—"বসুন, বসুন, বিশ্রাম করুন। একটু সরবৎ-টরবৎ খাবেন?"

—"দেখতেই পাচ্ছেন গলদঘর্ম্ম হয়ে উঠেছি! সরবৎ পেলে তো বাঁচি!"

সরবৎ পান ক'রে পাখার তলায় ব'সে ভূপতিবাবু যখন একটু ঠাণ্ডা হ'লেন, হেমন্ত বললে, "আপনি 'সাইকলজি' পড়েছেন?"

এই আকস্মিক প্রশ্নে বিস্মিত হয়ে ভূপতিবাবু বললেন, "কেন বলুন দেখি ?"

—"প্রত্যেক পুলিস-কর্ম্মচারীর উচিত মনোবিজ্ঞান পাঠ করা।"

—"প'ড়ে কি ঘোড়ার ডিম হবে ?"

—"এমন অনেক অপরাধ আছে, মনোবিজ্ঞানে পণ্ডিত না হ'লে যার গুপ্তকথা বোঝা যায় না। মানুষের মন হচ্ছে এক অদৃশ্য আশ্চর্য্য জগৎ। সেখানে একই সঙ্গে থাকে ভগবানের আশীর্ব্বাদ আর সয়তানের অভিশাপ। সেখানে কালোকে জড়িয়ে থাকে আলো। সেখানে কুৎসিতের সঙ্গে সুন্দর খেলে লুকোচুরি-খেলা। মানুষ সম্পূর্ণ ভালো বা সম্পূর্ণ মন্দ নয়—ঐ দুইয়ে জড়িয়েই মানুষ পূর্ণ আকার পায়। মনোবিজ্ঞানে জ্ঞান হ'লে বুঝবেন, দানবও করতে পারে দেবতার কাজ, আবার দানব হ'তেও দেবতার বেশীক্ষণ লাগে না। আপনারা আসামীর মনকে কেবল অপরাধীর মন ব'লেই ধ'রে নেন, গ্রহণ করেন না তাকে মানুষের মন ব'লে।"

—"বাপ রে, এযে কাব্যি !"

—"যা বললুম, মনে ক'রে রাখবেন। কেন বললুম, পরে বুঝতে পারবেন। যাক্, এ-কথা। তাহ'লে ভূপতিবাবু, আপনার মতে মহম্মদই হচ্ছে আসল অপরাধী ?"

—"নিশ্চয় ! নইলে সে পালাবে কেন ?"

—"এ যুক্তিটাও চমৎকার ! কিন্তু একটা মস্ত কথা ভুলবেন না। মৃত ডাক্তার বিশ্বাসের দরোয়ান আর ডাক্তার সুনীল চৌধুরীর মতে, যে-লোকটা দু-বারই মোটর থেকে নেমেছিল সে হচ্ছে এক কোলকুঁজো বৃদ্ধ, দাড়ী-গোঁফওয়ালা বাঙালী।"

—মহম্মদ হয়তো ড্রাইভারের পোষাক প'রে গাড়ীর ভিতরেই থাকে।"

—"সে-ক্ষেত্রেও আপনাকে স্বীকার করতে হবে যে, মহম্মদ গ্রেপ্তার হলেও হয়তো আসল হত্যাকারী ধরা পড়বে না!"

—"একজনকে ধরতে পারলে দলের আর-সবাইকে ধরতে কতক্ষণ!"

হেমন্ত অল্পক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর বললে, "আপনি একটা কথা জানেন ?"

—"কি ?"

—"ডাক্তার চৌধুরীর বাড়ীতে সেদিন মোহনলাল নামে আমাদের এক বন্ধুকে দেখেছিলেন, মনে আছে ?"

—"আছে।"

—"তিনমাস আগে মোহনলালের স্ত্রী মারা গেছেন।"

—"তাও শুনেছি।"

—"তার স্ত্রী মারা পড়েন অস্ত্রোপচারের পরেই। যে পাঁচজন ডাক্তার অস্ত্রচিকিৎসা করতে বলেন, তাঁদের নাম হচ্ছে মোহিনীমোহন দত্ত; এন. বসু; এম. সি. বিশ্বাস; সুনীল চৌধুরী আর সন্তোষকুমার সেন।"

এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে ভূপতিবাবু চীৎকার ক'রে বললেন, "অ্যাঁ, বলেন কি মশাই, বলেন কি ?"

—"দেখছেন, মোহনলালের বাড়ীর পাঁচজন ডাক্তারের মধ্যে আক্রমণ হয়েছে চারজনেরই উপরে। বাকি আছেন কেবল একজন, তাঁর উপরেও শীঘ্রই আক্রমণ হবে বলে আশা করছি।"

ভূপতিবাবু উত্তেজিত স্বরে বললেন, "আপনি তো বেশ

লোক দেখছি! জেনে-শুনেও এত-বড় কথাটা আমাকে বলেন নি, বন্ধুকে বাঁচাবার জন্যে বুঝি? এই বুদ্ধি নিয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছেন? গোয়েন্দার কাছে বন্ধু নেই, বাপ-মা নেই, ভাই-বোন নেই—কিছু নেই, কিছু নেই! চললুম আমি।"

—"আরে, দাঁড়ান, দাঁড়ান! কোথা যান?"

—"মোহনলালের খোঁজে।"

—"ঠিকানা না জেনেই?"

—"ঠিক কথা তো! দিন ঠিকানা।"

—"কিন্তু সেখানে গিয়ে কি করবেন?"

—"মোহনলাল কি বলে শুনব।"

—"সে যদি কিছু স্বীকার না করে?"

—"তাকে গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করব।"

—"কোন্ প্রমাণে?"

—"'সার্কামস্‌টান্সিয়াল এভিডেন্স' দেখে!"

—"দরকার কি অত হাঙ্গামে?"

—"মানে?"

—"আমি বলি খুনীকে হাতে-নাতে ধরবার চেষ্টা করুন।"

—"কি ক'রে?"

—"বসুন! তাকে ধরবার উপায় আমি স্থির করেছি।"

ভূপতিবাবু দরজার কাছ পর্য্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে আবার বসলেন।

আমার দিকে ফিরে মুখ টিপে হাসতে হাসতে হেমন্ত বললে, "বুদ্ধিমান রবীন, একটা বিষয় নিয়ে তুমি মাথা ঘামাবার সময় পেয়েছ?"

বুঝলুম, হেমন্তের দুষ্ট-বুদ্ধি জেগেছে, সে আমাকে অপদস্থ করবার ফিকিরে আছে। সাবধান হয়ে বললুম, "কি ?"

—"প্রথম খুন হয় কোন্ তারিখে ?"

—"একুশে জুলাই।"

—"তারপর ?"

—"আটাশে জুলাই, চউঠো আগষ্ট। ডাক্তার চৌধুরীর ওপরে আক্রমণ হয়েছে এগারোই আগষ্ট।

—"গুড্ বয়! তোমার স্মৃতিশক্তি প্রশংসনীয়। আজ ক' তারিখ ?"

—"আঠারোই আগষ্ট।"

—"এখন চিন্তা ক'রে দেখ, তারিখগুলোর মধ্যে কি লক্ষ্য করা উচিত ?"

ধাঁ-ক'রে মাথায় একটা সত্যের ইঙ্গিত জাগল। এতদিন তারিখগুলোকে পাশাপাশি সাজিয়ে আমি কিছু ভাববার চেষ্টা করিনি। আজ হঠাৎ আমার চোখ ফুটল! উত্তেজিতভাবে বললুম, "হেমন্ত, হেমন্ত! প্রতি সাতদিনের মাথায় হত্যাকারী একবার ক'রে দেখা দিয়েছে যে!"

—"জিতা রহ! তাহ'লে তোমার ঘটে কিঞ্চিৎ বুদ্ধি আছে ?"

ভূপতিবাবু বললেন, "ওঃ, এ লক্ষ্য করা তো খুবই সহজ!"

—"ঠিক। সেইজন্যেই তো বুদ্ধিমানরা সহজকে নিয়ে মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করেন না।...কিন্তু রবীন, তুমি এখনো আমার প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর দাও নি। আবার বলি, আজ আঠারোই আগষ্ট!"

আবার দেখতে পেলুম একটা সাংঘাতিক সত্যকে! আমি সভয়ে ব'লে উঠলুম, "কি সর্ব্বনাশ!"

—"কি ভয়ানক, কি ভয়ানক!" ব'লেই ভূপতিবাবু এমন ধড়্‌ফড়্‌ ক'রে উঠলেন যে, চেয়ারশুদ্ধ দড়াম্‌ ক'রে প'ড়ে গেলেন মাটির উপরে!

হেমন্ত হাসতে হাসতে বললে, "একবার কফিখানায়, আর-একবার এখানে। ভূপতিবাবু, একদিনেই আপনার হ'ল দু-বার পতন। উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত!"

ভূপতিবাবু এতটা উত্তেজিত হয়েছিলেন যে, তাঁর কিছুমাত্র লেগেছে ব'লে মনে হ'ল না! প'ড়েই চট্‌ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, "হেমন্তবাবু, হেমন্তবাবু! আজই যে হত্যাকারীর আবার আবির্ভূত হবার দিন!"

—"হ্যাঁ, সেইরকমই তো আশা করছি। এ হচ্ছে 'রোমান্টিক' হত্যাকারী! কেবল ডাক্তার মারে, তাসের পাঞ্জা ছড়ায়, নির্দ্দিষ্ট দিনে দেখা দেয়।" হেমন্ত বললে হাসিমুখে, শান্ত ভাবে।

—"কি আশ্চর্য্য, এ-সব জেনে-শুনেও আপনি স্থির হয়ে নিশ্চিন্ত ভাবে ব'সে ভাবতে পারছেন?"

—"যখন বিপদের ভয় নেই, হাসব না কেন?"

—"বিপদের ভয় নেই?"

—"কিছুমাত্র না।"

আমি বললুম, "আমাদের ধারণা যদি ঠিক হয়, খুনী তাহ'লে নিশ্চয়ই আজ ডাক্তার সন্তোষকুমার সেনের সঙ্গে দেখা করবে।"

—"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেখা করবে।"

—"তবু বলছ বিপদের ভয় নেই?"

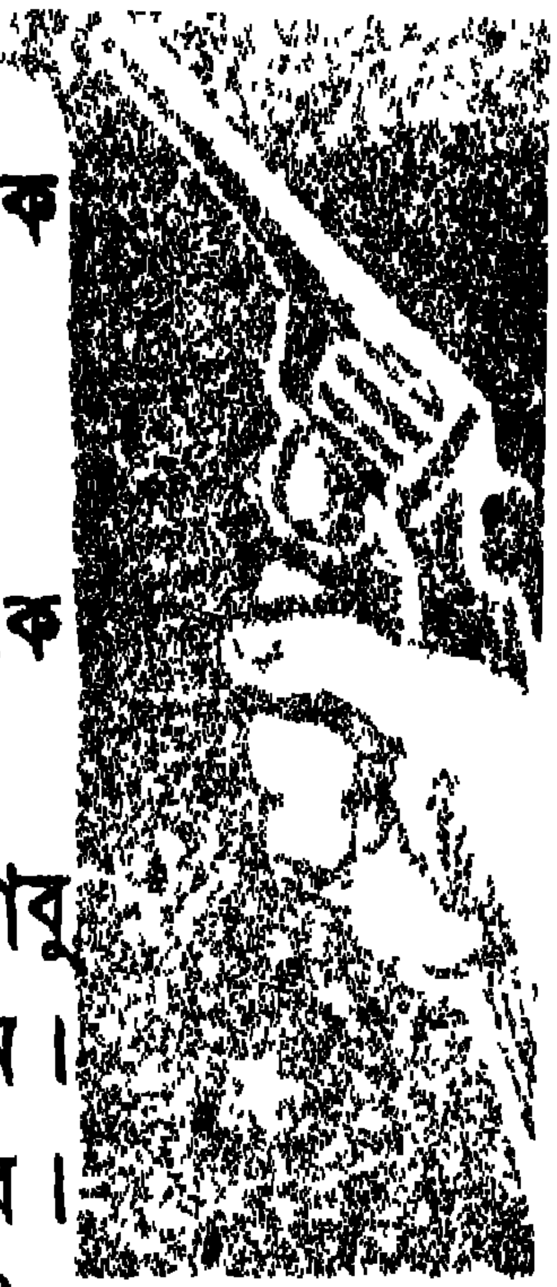

—"হ্যাঁ। আজ ভোর-বেলায় 'ফোনে' সন্তোষবাবুকে সাবধান ক'রে দিয়েছি।"

আমার বুক থেকে যেন একটা বোঝা নেমে গেল।

একটু আশ্বস্ত হ'য়ে ভূপতিবাবু বললেন, "কিন্তু খুনীকে ধরবার ব্যবস্থা করতে হবে তো?"

—"ও-কাজও খানিকটা এগিয়ে রেখেছি। সন্তোষবাবু ব্যাপারটা আজ কারুর কাছে প্রকাশ করবেন না বলেছেন। সন্ধ্যার পরেই বাড়ীর চারিদিকে পুলিস-পাহারা বসাতে হবে। ভূপতিবাবু, রবীন আর আমি থাকব সন্তোষবাবুর বাড়ীর ভিতরে। ভূপতিবাবুর আপত্তি আছে?"

—"আপত্তি? বিলক্ষণ! আমি তো পা বাড়িয়েই আছি! মহম্মুদে বেটাকে একবার বাগে পেলে হয়—আমার পেটে লাথি মারার সুখ ভোগ করাব!"

—"মহম্মদ এখনো আপনার ঘাড় ছেড়ে নামেনি?"

—"নামবে কি মশাই? দেখবেন, সে বেটা ঠিক ড্রাইভার সেজে গাড়ীর ভেতরে ব'সে আছে।"

—"হবেও বা!"

—"তাহ'লে এখন আমি তোড়জোড় করিগে যাই?"

—"যান।"

ভূপতিবাবু প্রস্থান করলেন।

হেমন্তের মুখ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল। শ্রান্ত স্বরে বললে, "মোহনলালের জন্যে আমার বড় দুঃখ হচ্ছে! কি করব, কর্ত্তব্য!"

এগারো

আঠারোই আগষ্ট

মধ্য-রাত্রের আগে হত্যাকারী কোনদিন আত্মপ্রকাশ করে নি, এ-কথা জেনেও আমরা একটু তাড়াতাড়িই—অর্থাৎ রাত্রি নয়টার সময়ে বালিগঞ্জের ডাক্তার সন্তোষবাবুর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলুম।

আজ অপরাধী গ্রেপ্তার হবার সম্ভাবনা, তবু আমার মনে আনন্দ হচ্ছিল না কিছুমাত্র। বরং মোহনলালের মুখের কথা ভেবে বুকটা ভ'রে যাচ্ছিল গভীর মায়ায়। শৈশব থেকে কৈশোর কাল পর্য্যন্ত তার সঙ্গে আমরা একসঙ্গে পড়াশোনা, খেলাধূলো করেছি, সেই সব মধুর স্মৃতিছবি চোখের সামনে জেগে উঠতে লাগল বারংবার। সেই মোহনলালকে আজ এরি মধ্যে দেখতে পেলুম যেন, অসহায়ভাবে ফাঁসিকাঠে দোদুল্যমান! কি ভয়ানক! কেন তার মাথায় চাপল এই নরহত্যার পাগলামি? আহা, তার সদ্যমাতৃহারা ছেলেমেয়ে-দুটির কি দুর্ভাগ্য!

সন্ধ্যার পরেই একদল পাহারাওয়ালা ও একদল সার্জ্জেণ্ট সন্তোষবাবুর বাড়ীর আশেপাশে চোখের আড়ালে আত্মগোপন করেছে।

একখানা বাগানওয়ালা বাড়ীর ফটকের মধ্যে ঢুকে গাড়ী-বারান্দার তলায় গিয়ে দাঁড়ালুম! আমরা হেমন্তের মোটরে এসেছি, গাড়ী চালাচ্ছিল হেমন্ত নিজেই।

ভূপতিবাবু নেমে প'ড়ে বললেন, "হেমন্তবাবু, আপনার মোটরখানা এইখানেই হাতের কাছে থাক্। মোহনলাল ধরা পড়বার পর তার ড্রাইভার যদি গাড়ী ছুটিয়ে পালায়, তাহ'লে আমরা আপনার মোটরখানা ব্যবহার করতে পারব।"

ভূপতিবাবুর আগ্রহ দেখছি মহম্মদের জন্যেই। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস, সেই-ই চালিয়ে আসবে মোহনলালের মোটর! দেখা যাক্, তাঁর না আমাদের—কার সন্দেহ সত্যে পরিণত হয়!

সন্তোষবাবু বাইরে এসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। কিন্তু তাঁর মুখে-চোখে ভয়ের আভাস, ভাবভঙ্গি জড়োসড়ো।

ভূপতিবাবু বললেন, "মিঃ সেন, আপনার বাগানটা বড়-বেশী অন্ধকার!"

—"কি করব, সরকারি হুকুম!"

সন্তোষবাবুর সঙ্গে সঙ্গে আমরা বাড়ীর ভিতরে ঢুকলুম।

প্রথম ঘরখানায় ঢুকে সন্তোষবাবু বললেন, "এইখানে আমি রোগী দেখি।"

হেমন্ত এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে বললে, "এই পাশের ঘরটায় আমরা থাকতে পারি?"

—"স্বচ্ছন্দে।"

—"ও-ঘরের আলো নিবিয়ে, দরজাটা একটু খোলা রেখে আমরা অপেক্ষা করব। এ ঘরে যে আসবে, আমাদের চোখের উপরেই থাকবে।"

ভূপতিবাবু বললেন, "অপরাধী ডাক্তারবাবুকে আহ্বান করলেই তিনি পোষাক পরবার জন্যে উপরে যাবেন। তারপরেই আমাদের আক্রমণ!"

সন্তোষবাবু বললেন, "জরুরি কেসের জন্যে আমার এখানে

অনেক রুগী আসে, তাদের আপনারা আসামী ব'লে ভুল করবেন না তো?"

ভূপতিবাবু গম্ভীর চালে বললেন, "পুলিসের চোখ অত বোকা নয়। আমরা গোঁফ দেখেই শিকারী বেড়ালকে চিনতে পারি।"

হেমন্ত বললে, "আসামীর স্বরূপ আমরা চিনি, আর ছদ্মরূপের পেয়েছি উজ্জ্বল বর্ণনা। ভয় নেই মিঃ সেন, আপনার কোন নিরীহ রুগীকে ধ'রে আমাদের চালান দিতে হবে না!"

সন্তোষবাবু ম্রিয়মাণ কণ্ঠে বললেন, "কিন্তু আমার বুক কাঁপছে!"

ভূপতিবাবু তাঁর কাঁধের উপরে হাত রেখে বললেন, "বুককে স্থির করুন। আমরা আছি কি জন্যে?"

আমরা পাশের ঘরের দিকে অগ্রসর হলুম।

ভূপতিবাবু হাত-ঘড়ি দেখে বললেন, "মোটে সাড়ে ন'টা। এখনো রঙ্গমঞ্চে নায়ক আসতে অনেক দেরি। মিঃ সেন, কিছু চা-টার ব্যবস্থা হ'তে পারে?"

হেমন্ত বললে, "মনে রাখবেন মিঃ সেন! ভূপতিবাবু চায়ের সঙ্গে যোগ করেছেন টা!"

সন্তোষবাবু হাসবার চেষ্টা ক'রে বললেন, "মনে রাখব।"

ভূপতিবাবু বললেন, "আর শুভস্য শীঘ্রং!"

পাশের ঘরে প্রবেশ ক'রে হেমন্ত বললে, "এখান থেকে ফটক আর রাস্তা পর্য্যন্ত দেখা যায়। ভালো কথা।"

খানিক পরে চায়ের সঙ্গে এল ঘরে-তৈরি কচুরি, সিঙাড়া, নিম্‌কি। ভূপতিবাবুর ঠোঁট উপছে বেরিয়ে পড়ল আনন্দের হাসি।

আমার একটুও খেতে ইচ্ছে হ'ল না। হেমন্তেরও তাই।

তিন পেয়ালা চা আর তিন থালা খাবার নিয়ে বিপদগ্রস্ত হবার পাত্র ভূপতিবাবু নন। বরং বেড়ে উঠল তাঁর খুসির মাত্রা।

শূন্য পাত্রগুলোর সঙ্গ ত্যাগ ক'রে ভূপতিবাবু যখন গাত্রোত্থান করলেন, রাত তখন সাড়ে-দশটা।

হেমন্ত বললে, "এইবারে আলো নিবিয়ে দেওয়া যাক্।"

ঘর অন্ধকার। জান্‌লা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাগানের অস্পষ্ট আলোর আভাস। ঘরের বড় দেওয়াল-ঘড়ীটা টক্-টক্ শব্দে যেন আলাপ করতে চাইছে স্তব্ধতার সঙ্গে।

এর মধ্যেই রাস্তা নির্জ্জন হয়ে পড়েছে। প্রথমে মাঝে মাঝে দু-একখানা ছুটন্ত মোটরের শব্দ শোনা গেল, তারপর তাও গেল থেমে। কেবল ঝিঁ-ঝিঁদের ব্যাণ্ড অশ্রান্ত। দু-একবার ভেসে আসে পল্লীর কোন-কোন বাড়ীর হঠাৎ-জাগা শিশুর কান্না। থেকে থেকে সাড়া দেয় প্যাঁচাদের চেরা কণ্ঠ।

ঘড়ীতে বাজল সাড়ে-এগারটা।

ভূপতিবাবু বললেন, "বড্ড মশা কাম্‌ড়াচ্ছে।"

হেমন্ত বিস্ময়প্রকাশ ক'রে বললে, "বলেন কি! মশার পল্‌কা হুল পুলিসের চাম্‌ড়াও ভেদ করতে পারছে!"

—"এ বালিগঞ্জের মশা। ভগবান কি সয়তান কিছুই মানে না।"

—"কিন্তু আমি তো জানতুম কলকাতার পুলিস ভগবান আর সয়তানেরও উপরওয়ালা!"

—"আমরা সখের গোয়েন্দা নই, ঠাট্টার রাজ্যে ভগবানকে নিয়ে টানাটানি করি না।"

—"আপনাদের বন্ধুত্ব কেবল বুঝি সয়তানের সঙ্গে?"

এই কথা-কাটাকাটি হয়তো আরো কিছুক্ষণ উপভোগ

করতে পারতুম, কিন্তু দূরে জাগল একখানা মোটরের শব্দ! তখনি দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখ হয়ে গেল একেবারে বোবা।

গাড়ীর শব্দ যত কাছে আসছে, আমার বুকের তাল হয়ে উঠছে তত দ্রুত!

গাড়ী ফটকের বাইরে এসে থামল। তাহ'লে সঙীন মুহূর্ত্ত কি উপস্থিত?

আবছা-আলোতে জানলা দিয়ে দেখা গেল, একটা শ্বেতবসন মূর্ত্তি ফটক পার হয়ে ঢুকল বাগানের ভিতরে। পথের উপরে বাজছে তার লাঠি ঠক্, ঠক্, ঠক্!...লাঠির শব্দ থামল গাড়ী-বারান্দার তলায়।

সেখানে অপেক্ষা করছিল সন্তোষবাবুর বেয়ারা। আগন্তুক অতি মৃদু স্বরে কি বললে, বোঝা গেল না।

উত্তরে বেয়ারা বললে, "ডাক্তারবাবু আছেন। আপনি ভেতরে আসুন, আমি খবর দিচ্ছি।"

আগন্তুক ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল। দরজার ফাঁক দিয়ে তাকে দেখতে পেলুম। কিন্তু সরকারি হুকুম তামিল করবার জন্যে ঘরের আলোর উপরে যে চোঙা পরানো হয়েছিল, সে রইল তার আলোক-রেখার বাইরেই। তার মুখ স্পষ্ট ক'রে দেখা যায় না বটে, কিন্তু তার চোখের কালো চশ্মা, মাথার লম্বা পাকা চুল, মুখের দীর্ঘ শুভ্র দাড়ী, ধনুকের মতন বেঁকে-পড়া দেহ—এ-সব বোঝা গেল অল্পবিস্তর। সে যে সন্দিগ্ধ ভাবে আমাদের ফাঁক-করা দরজার পানে বার বার তাকাচ্ছে, এটাও নজর এড়ালো না।

ভূপতিবাবু ছিলেন আমাদের পিছনে। আগন্তুককে ভালো ক'রে দেখবার জন্যে তিনি সাগ্রহে এগিয়ে আসতে গেলেন,

কিন্তু ঘরের অন্ধকারে দেখতে না পেয়ে পড়লেন গিয়ে একখানা চেয়ারের উপরে, অত্যন্ত ধুমধাড়াক্কা ক'রে!

এক পলকে আগন্তুকের দুমড়ে-পড়া দেহ সচমকে একেবারে সিধা হয়ে উঠল এবং পরমুহূর্ত্তে সে হ'ল ঘরের ভিতর থেকে অদৃশ্য! তারপরেই বাগানের পথে শুনলুম তার ছুটন্ত পদশব্দ!

তীরবেগে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে হেমন্ত তার মোটরে 'ষ্টার্ট' দিতে লাগল এবং আমার পিছনে পিছনে ভূপতিবাবুও দৌড়ে এলেন খুব জোরে 'হুইসিল্' বাজাতে বাজাতে।

আমরা মোটরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই হেমন্ত গাড়ী চালিয়ে দিলে—কিন্তু আসামীর গাড়ীও তখন বেগে ছুটে চলেছে! বাঁশী শুনে ততক্ষণে নানা গুপ্তস্থান থেকে পাহারাওয়ালারা বেরিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে অগ্রবর্ত্তী মোটরের ভিতর থেকে পাঁচ-ছয়টা রিভলভারের গুলি ছুটে এসে তাদের কর্ত্তব্য পালনের উৎসাহকে দিয়েছে প্রচণ্ড বাধা।

আমাদের গাড়ী ফটক পার হ'তেই একজন সার্জ্জেণ্ট্ ও দু'জন পাহারাওয়ালা পা-দানের উপরে লাফ মেরে উঠে পড়ল। চকিতের মধ্যে চলন্ত গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখে নিলুম রাজপথে ছটফট্ করছে একটা পাহারাওয়ালা।

সোজা পথ। প্রায় দেড়শো গজ দূরে দেখা গেল, তীব্রবেগে দৌড়চ্ছে আসামীর মোটরখানা!

ভূপতিবাবু হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ক্রমাগত চ্যাঁচাচ্ছেন, "আরে ও হেমন্তবাবু! আরে আরে, করছেন কি! আরো জোরে চালান—আরো, জোরে, আরো জোরে! হায়, হায়, হায়, হায়, আসামী ভাগ্ল যে!"

মোটরের হুইল ধ'রে সামনের দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে, হেমন্ত ক্রুদ্ধ কর্কশ কণ্ঠে ধমক দিয়ে উঠল, "থামুন আপনি! আপনার জন্যেই আসামী পালিয়েছে!"

ভূপতিবাবু একেবারে চুপ মেরে গেলেন।

কিন্তু হেমন্তের গাড়ীখানা আসামীর গাড়ীর চেয়ে ঢের-বেশী শক্তিশালী ও বেগবান। দু'খানা গাড়ীর মধ্যে ব্যবধান ক'মে আসছে তাড়াতাড়ি।

...আসামীর গাড়ী এখন বোধহয় চল্লিশ গজের চেয়ে বেশী দূরে নেই।

মিনিট-দেড়েক পরে আগের মোটরখানা হঠাৎ একখানা বাড়ীর সামনে থেমে পড়ল—ভিতর থেকে লাফ মারলে একটা মূর্ত্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মোটরখানাও ঠিক সেইখানেই গিয়ে রুদ্ধ করলে গতি! এক সেকেণ্ডের মধ্যে আমরাও গাড়ীর বাইরে! অস্পষ্ট আলোকে দেখলুম, বাড়ীর সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আসামী আমাদের লক্ষ্য ক'রে রিভলভারের ঘোড়া টিপ্‌লে—ভূপতিবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "হুঁসিয়ার!"—কিন্তু কোন আওয়াজ শোনা গেল না, আসামীর রিভলভারে আর গুলি নেই!

হেমন্ত বিদ্যুৎবেগে দরজার দিকে ছুটে গেল—আসামীও ভিতরে ঢুকে সামনের সিঁড়ি দিয়ে এক এক লাফে দু'তিনটে ধাপ পার হয়ে উপরে উঠতে লাগল!

আমি উপরে উঠতে-উঠতেই শুনলুম, দড়াম্ ক'রে একটা দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ!

দোতালায় গিয়ে দেখি, হেমন্ত একটা বন্ধ-দরজার উপরে দুম্-দাম্ লাথি মারছে!

তার প্রবল পদাঘাতে দরজার খিল ভেঙে যেতে দেরি লাগল না।

একটা ঘর। তারও এক দেওয়ালে ওধার থেকে বন্ধ-করা একটা দরজা।

এবার হেমন্তের সঙ্গে আমিও দরজার উপরে পদাঘাত করতে লাগলুম। ভূপতিবাবুও এসে পড়লেন।

আচম্বিতে ঘরের ভিতরে হ'ল রিভলভারের শব্দ। তারপর শুনলুম, একটা ভারি জিনিষের পতন-শব্দ।

ভূপতিবাবু বললেন, "ও আবার কে রিভলভার ছোঁড়ে?"

হেমন্ত হতাশ ভাবে বললে, "আসামী। সে রিভলভারে গুলি ভরবার সময় পেয়েছে। আত্মহত্যা করলে!"

আমি আর বার-দুয়েক পদাঘাত করবার পরই খিল ভেঙে দরজা খুলে গেল।

হেমন্ত বললে, "রবীন, ঘরের ভিতরে যেও না। ঘরের ভিতরে চেও না। প্রাণে কষ্ট পাবে।"

আমি তখন খোলা দরজার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখছিলুম, মেঝের উপরে প'ড়ে আছে যেন একটা স্তূপীকৃত কাপড় বা বস্তা। ও-ঘরটা অন্ধকার, এ-ঘর থেকে ছড়িয়ে-পড়া আলোর আভায় তার বেশী কিছু আর দেখা যাচ্ছে না।

হেমন্তের কথা শুনে ফিরে বললুম, চেষ্টা করলে হয়তো মোহনলাল এখনো বাঁচতে পারে! হয়তো ও মারাত্মক ভাবে জখম হয় নি!"

হেমন্ত ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, "কবলগত শিকারকে নিয়ে তুমি কি বিড়ালের মত নিষ্ঠুর খেলা খেলতে চাও? ওকে বাঁচিয়ে লাভ কি, ফাঁসিকাঠে ঝুলবে ব'লে? চ'লে এস রবীন, এদিকে

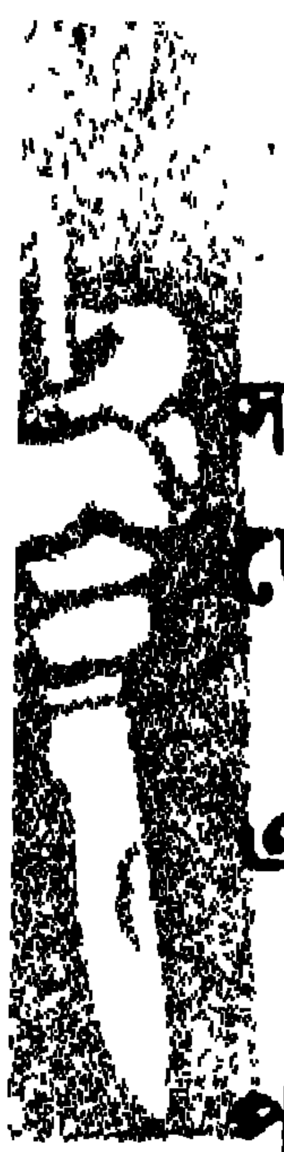

স'রে এস—একটা মহৎ প্রাণের এই শোচনীয় পরিণাম স্বচক্ষে দেখাও এক চরম শাস্তি !"

সত্যকথা। হতভাগ্য মোহনলাল ! হেমন্তের সঙ্গে আমি এ-ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

ভূপতিবাবু বললেন, "হেঁঃ ! ও-সব 'সেন্টিমেণ্ট' নিয়ে পুলিসের কাজ চলে না ! মহৎ প্রাণের শোচনীয় পরিণাম ! খুনীর জন্যে দরদ ! ধেৎ !"—ইলেকট্রিক টর্চ্চটা জ্বেলে মেঝে-কাঁপানো পা ফেলে তিনি পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

শুনলুম উৎকট আনন্দে তিনি হত বা আহত মোহনলালকে উদ্দেশ ক'রে বলছেন, "বাপু, লীলাখেলা তো সব ফুরুলো, এখনো মুখে ঐ পরচুলার গোঁফ-দাঁড়ি কেন ? দেখি, শ্রীবদন-খানি একবার দেখি !"—তারপরই শুনলুম ভূপতিবাবুর সচকিত, বিস্মিত চীৎকার—"এ কি ব্যাপার ? ও হেমন্তবাবু, এ কে ? এ তো মোহনলাল নয় !"

হেমন্ত একটুও বিস্মিত না হয়ে বললে, "আমি তা জানি।"

—"একে তো আমি চিনি না !"

—"কিন্তু আমি চিনি। উনি হচ্ছেন ঈশানপুরের দানবীর ধার্ম্মিক জমিদার পরমানন্দ রায়-চৌধুরী।.........এস রবীন আমরা স'রে পড়ি।.........ভূপতিবাবু, সব রহস্য যদি বুঝতে চান, কাল সকালে আমার বাড়ীতে যাবেন !"

বারো

"স্নায়ুজমনোক্রিয়া"

পরের দিন সকালবেলা। আমাদের চা-পান সমাপ্ত।

হেমন্ত তার নির্দ্দিষ্ট ইজি-চেয়ারে আশ্রয় গ্রহণ করলে। তার সামনে গিয়ে বসলুম আমি। আমার পাশে ভূপতিবাবু।

হেমন্ত বললে, "ভূপতিবাবু, আমি কাল জিজ্ঞাসা করেছিলুম, আপনি 'সাইকলজি' পড়েন কিনা? পুলিসের পক্ষে সেটা অনাবশ্যক ব'লে আপনি দিলেন ফতোয়া। সেই সম্পর্কে আমি গুটিকয়েক কথা ব'লেছিলুম, তাও আপনি উড়িয়ে দিলেন 'কাব্যি' ব'লে। আপনার কিছু মনে আছে, আমি কি ব'লেছিলুম?"

—"ইয়ে—ওর নাম-কি——কাব্যি-টাব্যি আমার মনে থাকে না। তবে কিছু-কিছু ভাসা-ভাসা স্মরণ হ'চ্ছে যেন।··· 'মানুষের মন নাকি আশ্চর্য্য এক জগৎ, সেখানে একই সঙ্গে থাকে ভগবানের আশীর্ব্বাদ আর সয়তানের অভিশাপ।······ মনোবিজ্ঞান জানলে না কি বোঝা যায়, দানবও করতে পারে দেবতার কাজ, আবার দানব হ'তেও দেবতার বেশীক্ষণ লাগে না'—এম্নিতর কী সব ব'লেছিলেন আপনি!"

হেমন্ত বললে, "এর মধ্যে আপনি পেয়েছিলেন কেবল 'কাব্যি'—অথচ এর মধ্যেই আছে বর্ত্তমান মামলার সমস্ত রহস্য! পরমানন্দবাবু কেবল দানবীর ছিলেন না, তিনি সারা দেশের

শ্রদ্ধা পেয়েছেন পরম সাধু ব'লে। অথচ তাঁর মতন দেবতার বুকে জেগেছে যে দানবের মন, তিনি ধরা পড়বার আগেই আমি সেটা আন্দাজ করেছিলুম।"

ভূপতিবাবু বললেন, "মানলুম। কিন্তু আমাদের শেষ-কাজ আদালত নিয়ে। আদালতে মশাই, আন্দাজের ঠাঁই নেই। আদালত বলবে—কেন আন্দাজ ক'রেছিলে বাপু? তোমার যুক্তি কি?"

—"তাহলে মনোবিজ্ঞানের রহস্য নিয়ে আমাকে ছোট-খাটো একটি বক্তৃতা দিতে হয়। শুনতে রাজি আছেন?"

—"পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হ'বে সাথে। কি আর করব? বলুন।"

ইজি-চেয়ার থেকে হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপরে রক্ষিত "Encyclopedia of Good Health" এর একখণ্ড তুলে নিয়ে হেমন্ত বললে, "বিলাতের প্রথম শ্রেণীর বড় বড় চিকিৎসক আর পণ্ডিতদের সাহায্যে এই বিরাট বইখানি লেখা হয়েছে। এর দ্বিতীয় খণ্ডে ৯৭২ পৃষ্ঠায় "Obsession" সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছে, আপনি পরে তা প'ড়ে দেখবেন। এ-সম্বন্ধে আমি আরো অনেক বই পড়েছি, হাতে-নাতে পরীক্ষাও করেছি। সেই-সব অবলম্বন ক'রেই আমি দু-চার কথা বলতে চাই, শুনুন। ....ইংরেজী fixed ideaর বাংলা কি? অচল-প্রতিষ্ঠ বা অটল, ভাবনা। যে ভাবনা মনের ভিতরে গেঁথে যায়। অস্থায়ী ভাবে সময়ে সময়ে এইরকম ভাবনার দ্বারা আমরা সকলেই আক্রান্ত হই। যেমন ধরুন, হয়তো একটা গানের কলি এমন নাছোড়বান্দার মতন আমাদের মাথার ভিতরে ঢুকে বসল যে, কিছুতেই তাকে তাড়াতে না পেরে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সেই

কলিটা মনে মনে ব... গাইতে আমরা বাধ্য হই। কেউ কেউ এই অবস্থায় ... দিন, দুদিন—এমন কি দু-তিন হপ্তা পর্য্যন্ত কাটিয়ে দেয়।

কোন কারও মনে fixed idea আরো নানারকম প্রভাব বিস্তার করে। কেউ কেউ হয়তো বাড়ী থেকে পথে বেরিয়েই প্রথমে ... মনে হয় বা আট সংখ্যা পর্য্যন্ত গুণে পদক্ষেপ করে। বিলাতের অমর লেখক ডক্টর জনসন আর এক ভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি পথে বেরিয়ে থাম্ পেলেই তার উপরে লাঠি দিয়ে ঘা না মেরে থাকতে পারতেন না। এ-সব হচ্ছে ছোট ছোট নিরাপদ্ অভ্যাস। পণ্ডিত বা মুর্খ সকলেই এ-রকম অভ্যাসের দাস হ'তে পারে।

"Obsessional neurosis" বা একজাতীয় স্নায়ুজমনো-ক্রিয়ার দ্বারা যে-সব রোগী আবিষ্ট হয়, তাদের অবস্থা হয়ে ওঠে গুরুতর। তাদের মনে কোন অটল ভাবনা এমন সব আবেগ বা ঝোঁকের সৃষ্টি করে, যা সম্পূর্ণরূপে তাদের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। যে সাধু, তারও মনে আসে হয়তো অটল দুষ্ট চিন্তার আবেগ; সে নিজের দুর্ব্বলতায় ক্রুদ্ধ হয়ে প্রাণপণে ঐ কুচিন্তাকে তাড়াতে চেষ্টা করে; অনেকেই সক্ষম হয়, আবার অক্ষমও হয় কেউ কেউ। এই অবস্থায় কোন কোন রোগীকে মাঝে মাঝে সাংঘাতিক অপরাধ করতেও শোনা যায়। অথচ অপরাধ করা তাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। এই-সব নির্দ্দিষ্ট চিন্তা প্রায়ই অর্থহীন আর অসঙ্কোচিত হয়; রোগী তা বুঝতে পারে তবু তার কবল থেকে নিস্তার পায় না।

"ভূপতিবাবু, আমি খুব সংক্ষেপে যে গোড়ার কথাগুলি বললুম, তা আমার মন-গড়া কথা নয়, বড় বড় মনোবিজ্ঞানবিদ্

আর চিকিৎসকরা বহু পরীক্ষা আর আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন। এইবারে দেখা যাক্, মনোবিজ্ঞানের এই রহস্যের সঙ্গে আমাদের মাম্‌লার সম্পর্ক কি!"

ভূপতিবাবু রুমাল বার ক'রে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, "বাব্বাঃ, আপনার 'সাইকলজি'র লেক্‌চার সাঙ্গো হ'ল, বাঁচলুম! এরি মধ্যে আমার মাথা গুলিয়ে উঠছিল, ও-সব কি আমাদের মগজে ঢোকে মশাই?"

হেমন্ত চেয়ারের উপরে আড় হ'য়ে চোখ বুঁজে বলতে লাগল, "এই ডাক্তারের পর ডাক্তার খুন, প্রতি সাত দিনের মাথায় হত্যাকারীর আবির্ভাব আর ঘটনাক্ষেত্রে তাসের পাঞ্জা নিক্ষেপ দেখেই আমি সন্দেহ ক'রেছিলুম যে, অপরাধী কেবল 'রোমান্টিক' নয়, তার মনে কাজ করছে কোনরকম fixed idea!

"এক-একটা খুন হয়, আর তাসের কাটা ফোঁটার সংখ্যা বাড়ে আর সেই সঙ্গে লক্ষ্য করলুম পাঞ্জা ছাড়া আর কোনরকম তাস ব্যবহৃত হয় না। বেশ বুঝলুম খুনী জানাতে চায়, সে পাঁচজন লোককে বধ করবে। প্রশ্ন হ'তে পারে, এ রকম ছেলেমানুষী বাহাদুরির কোন মানে হয় না। উত্তর হচ্ছে, fixed ideaর একটা বড় লক্ষণই হচ্ছে অর্থহীন বালকতা।

"উপরি-উপরি সপ্তাহে একবার ক'রে তিনবারে তিনটে হত্যা আর তিনবারই বলি দেওয়া হ'ল এক-একজন ডাক্তারকে! খোঁজ নিয়ে জানলুম ঐ তিন ডাক্তারই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত বা কোন নির্দিষ্ট দলভুক্ত নন। অথচ খুন করছে একজন লোকই। কোন ডাক্তারেরই কাছ থেকে মূল্যবান্

কিছু চুরি যায়নি, বা তাঁদের মৃত্যুতে কারুরই লাভবান হবার সম্ভাবনা নেই। তখন ব্যাপারটা ঠেকল হেঁয়ালির মত।

"এ-রকম হয় না, হ'তে পারে না। প্রত্যেক খুনের পিছনে কোন-না-কোন অর্থ বা উদ্দেশ্য থাকেই। কিন্তু এ-সব খুন অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন।

"তখন আমার মাথায় সন্দেহ জাগে, হত্যাকারী কোনরকম obsession বা স্নায়ুরোগের দ্বারা আক্রান্ত নয় তো? ব্যাপারটা নিয়ে মাথার ভিতরে যতই নাড়াচাড়া করতে লাগলুম, সন্দেহ দৃঢ় হয়ে উঠতে লাগল তত।

"তারপর হ'ল চতুর্থ আক্রমণ। ভাগ্যে 'সিগারেট-কেসে'র দৌলতে ডাক্তার সুনীল চৌধুরী বেঁচে গেলেন, তাই তাঁর মুখে শুনতে পেলুম, আক্রমণের আগে হত্যাকারী গর্জ্জন ক'রে বলেছিল—'প্রতিশোধ'!......কিন্তু কিসের প্রতিশোধ? ডাক্তার চৌধুরী বললেন, তাঁর কোন শত্রু নেই! তবে হত্যাকারী প্রতিশোধ নিতে চায় কেন? আন্দাজ করলুম, আগেকার তিন খুনের সময়েও নিশ্চয় সে ঐ 'প্রতিশোধ' কথাটা উচ্চারণ করেছিল! তবে কি হত্যাকারী তার নিজের কল্পিত কোন অন্যায় কার্য্য বা অপরাধের জন্যে পাঁচ-পাঁচজন ডাক্তারকে খুন করবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে? আগে যে সন্দেহ করেছিলুম, হত্যাকারীর দ্বারা চতুর্থ ডাক্তারকে আক্রমণ দেখে সেই সন্দেহ পরিণত হল নিশ্চিত সত্যে। আমি দেখতে পেলুম স্পষ্ট আলো।

"তারপর হত্যাকারীকে আবিষ্কার করবার জন্যে আমি কোন পথ অবলম্বন করতুম জানি না, কিন্তু নিয়তি যেন ডাক্তার চৌধুরীর বাড়ীতে যথাসময়ে পাঠিয়ে দিলেন আমার বাল্যবন্ধু মোহনলালকে।

"মোহনলালের বাড়ীতে গিয়ে খোলা পেলুম রহস্য-রাজ্যের দরজা। প্রথমেই জানলুম, যাঁদের উপরে আক্রমণ হয়েছে, তাঁরা সকলেই ছিলেন তার মৃতা স্ত্রীর চিকিৎসক। তার আর তার শ্বশুরের আন্তরিক ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাঁচজন ডাক্তারের মতে যে অস্ত্রচিকিৎসা হয়, মোহনলালের স্ত্রী মারা পড়েন তারই ফলে।

"প্রথমেই আমার সন্দেহ হয় মোহনলালের উপরে। প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুর জন্যে সে হয়তো দায়ী করেছে ঐ পাঁচজন ডাক্তারকেই। সে বিশ্বাস করে ওঁদের হত্যাকারী ব'লে—ধীরে ধীরে ওঁদের উপরে তার মনে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে একটা বিজাতীয় মারাত্মক ঘৃণা। দিন-রাত এই কথা ভেবে-ভেবেই সে এমন ভীষণ obsessional neurosis রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। সে সাধু, সচ্চরিত্র বটে, কিন্তু ও-রোগ সাধুরও মনে আনে ভয়াবহ পাপ-চিন্তার বা গুরুতর অপরাধের প্রেরণা। কিন্তু ঠিক তার পরেই দৈবগতিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল আসল আসামীর দিকে।

"রবীন্? মনে আছে, মোহনলালের বাড়ী থেকে ফেরবার পথে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করনি ব'লে তোমাকে আমি ভৎ'সনা ক'রেছিলুম? ব্যাপারটা হচ্ছে এই:

"মোহনলালের বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এসেই দেখলুম, পরমানন্দবাবু সিঁড়ি দিয়ে উপর থেকে নেমে আসছেন। হাতে একগাছা মোটা লাঠি—আর সে লাঠি ধ'রেছেন তিনি **বাম হাত** দিয়ে! এটা যে কত বড় প্রমাণ তা আর বোধ হয় ব'লে দিতে হবে না! ডাক্তার বিশ্বাসের মৃতদেহের পাশের জমি পরীক্ষা ক'রেই প্রথমে আমি জেনেছিলুম হত্যাকারীদের একজন বামহাতে লাঠি ব্যবহার করে। তারপর ডাক্তার

চৌধুরীও ব'লেছিলেন, আক্রমণের রাতে যে তাঁকে ডাকতে এসেছিল, লাঠি ছিল তার বাম হাতেই।

"ধার্ম্মিক, দানশীল পরমানন্দবাবু একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে ঐ দারুণ "obsessional neurosis" রোগে পাগলের মতন হয়ে গিয়েছিলেন। আগেই বলেছি, ও রোগের রোগী যত বড় সাধুই হোক, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই পাপ-কাজ করতে চায়! অবশ্য শতকরা নিরানব্বই জন লোক এই পাপ-ইচ্ছা কোনরকমে দমন করতে পারে, বাকি কেউ কেউ পারে না। 'ঐ ডাক্তাররা আমার একমাত্র সন্তানকে হত্যা করেছে, আমিও তার প্রতিশোধ নেব'—এই ছিল পরমানন্দবাবুর obsession! তিনি নিশ্চয়ই ঐ ভাবের কবল থেকে আত্মরক্ষার প্রবল চেষ্টা ক'রেও তা পারেন নি—শেষ-পর্য্যন্ত সম্মোহিত ভাবে, ছদ্মবেশ প'রে হত্যাকারীর মূর্ত্তি ধরতে বাধ্য হয়েছেন! রোগ তাঁর হাত রক্তাক্ত করেছে বটে, কিন্তু আসলে তিনি যে মহৎ সাধু ব্যক্তি, এ-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। এ এক বিচিত্র ট্রাজেডি, আগে জানলে মামলাটা আমি গ্রহণ করতুম না।"

ঘর স্তব্ধ। খানিকক্ষণ আমরা সকলেই অভিভূতের মতন ব'সে রইলুম।

তারপর আমি বললুম, "তাহ'লে সেই "ক্লোরিণ" ব্যবহারের জন্যেও দায়ী হচ্ছেন পরমানন্দবাবুই?"

হেমন্ত বললে, "বলা বাহুল্য। পাপের সঙ্গে ভাব করলে এক পাপ আনে তার শত পাপ-অনুচর। ধরা পড়লে পরমানন্দ-বাবুকে হারাতে হ'ত তাঁর প্রাণের চেয়ে বড়, দেশজোড়া মান-সম্ভ্রম। একরকম মরিয়া হয়েই তিনি আমার মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন! তাঁর উপরে আমার রাগ নেই।"

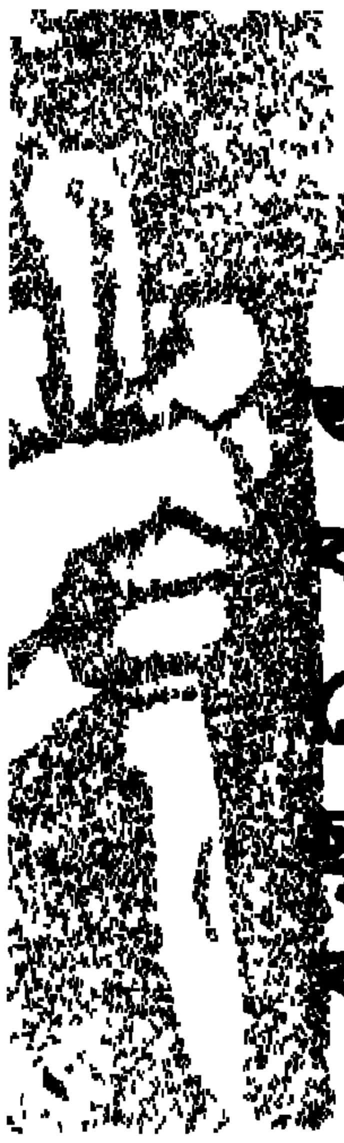

ভূপতিবাবু বললেন, "পরমানন্দবাবুর সেই মোটা লাঠিগাছটা আমরা পেয়েছি। সেটা গুপ্তি। কিন্তু তার হাতল টেনে বার করলে পাওয়া যায়, তরোয়াল নয়, একখানা ছোরা। সাধারণ ছোরাও নয়, ফলাটা লম্বায় ছয় ইঞ্চি, চওড়ায় পেন্সিল-কাটা ছুরির মত। ডাক্তার বিশ্বাসের ক্ষতচিহ্ন দেখে আপনিও এই কথা বলেছিলেন।"

হেমন্ত বললে, "আর একটা কথা জানতে চাই। আপনার মহম্মদ খাঁ ধরা পড়েছে তো?"

ভূপতিবাবু অধোবদনে বললেন, "মহম্মদের সঙ্গে এ মামলার কোন সম্পর্ক নেই।"

—"কিন্তু পরমানন্দবাবুকে সাহায্য করত আরো দুজন লোক, এটা আমরা জানতে পেরেছি।"

—"হ্যাঁ। তারাও কাল ধরা পড়েছে।"

—"কে তারা?"

—"দুটো নেপালী! তাদের একজন পরমানন্দবাবুর পুরানো ড্রাইভার, আর একজন পুরানো চাকর। তারা কালও গাড়ীর ভিতরেই ছিল।"

—"তাই তো ভূপতিবাবু, মহম্মদের লাথিকে তাহ'লে শাস্তি দিতে পারলেন না?"

ভূপতিবাবু আবার লজ্জায় মাথা হেঁট করলেন।

হেমন্ত বললে, "রবীন, এতক্ষণে মোহনলাল আমাদের কি ভাবছে, কে জানে! তার মুখ মনে ক'রে আমার কষ্ট হচ্ছে।"

শেষ